ইরশাদাত-ই আ'লা হযরত

[রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি]

বঙ্গানুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশনায়

আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

গবেষণা ও প্রকাশনা পরিষদ

SahihAqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

ইরশাদাত-ই আ'লা হযরত

বা

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী

[রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]-এর

কিছু বাণী

বঙ্গানুবাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশনায়

আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

গবেষণা ও প্রকাশনা পরিষদ

সূচীপত্র-

- আন্‌জুমানের সহ-সভাপতির বক্তব্য - ১
- আন্‌জুমানের সেক্রেটারী জেনারেলের বক্তব্য - ২
- অনুবাদকের কথা - ৩
- পূর্ণাঙ্গ ঈমান - ৯
- ঈমানের গুরুত্ব ও মূল্যায়ন - ৯
- আকীদার পরিপক্কতা - ১১
- আহলে কেবলাকে কাফির বলা নিষিদ্ধ - ১২
- ৯৯টি কুফরের ১টি মাত্র কথা ইসলামের - ১৪
- তাকদীর কি? - ১৫
- ওযুর জরুরী মাসাইল - ১৮
- নাকে পানি দেওয়ার নিয়ম - ১৯
- কুল্লি করার নিয়ম - ২০
- পানি প্রবাহিত করা - ২০
- গোপনাঙ্গ দেখলে ওযু নষ্ট হয় না - ২১
- কাযা নামায সম্পন্ন করার পদ্ধতি - ২২
- নামাযের কিছু জরূরী বিধান - ২৩
- প্রথম কাতারের ফযীলত - ২৫
- জামা'আত সহকারে নামাযের ফযীলত - ২৫
- জামা'আত ছেড়ে দেওয়ার শরীয়ত সম্মত ওযরসমূহ - ২৬
- ওযু,গোসল ও সাজদাহর মধ্যে আম-খাস লোকদের অসর্তকতাসমূহ - ২৭
- কিরআতে অসর্তকতা সমূহ - ২৮
- নফল নামাযসমূহে রূকুর অবস্থা - ২৮
- নামাযের গুরূত্ব - ২৯
- দ্বিতীয় জমা'আত চলাকালে সুন্নাত পড়া - ২৯
- জানাযা নামাযের কাতার সমূহ - ৩০
- ফজরের সুন্নাত কখন পড়বেন? - ৩০
- সালামের পর ডানে ও বামে ফিরে বসা - ৩০
- মসজিদের আদাব বা নিয়মাবলী - ৩১
- ওরস ও নারীদের উপস্থিতি - ৩২
- উল্টোদিক থেকে সূরা পড়ার ওযীফা - ৩৩
- মহর পরিশোধ করা - ৩৩
- আহারের আদাব বা নিয়মাবলী - ৩৪
- আহারের পর বর্তন লেহন করে খাওয়া - ৩৫
- প্রত্যেক দানার উপর সেটার আহারকারীর নাম লিপিবদ্ধ থাকে - ৩৬
- আহমদ ও মুহাম্মদ নামের ফযীলত সমূহে কতিপয় হাদীস - ৩৭
- হুযুরের পাদুকা শরীফের নক্‌শার বরকতসমূহ - ৩৯
- আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে তা'যীমী সাজদা করার বিধান - ৪০
- কবরকে চুমু দেওয়া ও তাওয়াফ করা - ৪০
- এ প্রসঙ্গে কতিপয় প্রশ্ন ও সেগুলোর উত্তর - ৪০
- মূল কবরের উপর লোবান ও আগরবাতি জ্বালানোর বিধান - ৪১
- মূল কবরের উপর চেরাগ জ্বালানো - ৪২
- মাযারগুলোর উপর চাদর-গিলাফ চড়ানো - ৪৩
- মুসলমানদের কবরের প্রতি সম্মান দেখানো - ৪৩
- মুহার্‌রম ও তা'যিয়া মিছিল - ৪৪
- মুহার্‌রমের কাপড় - ৪৬
- ওরস ও ক্বাওয়ালী - ৪৬
- বাদ্যযন্ত্র হারাম - ৪৭
- বিয়ের জন্য ভিক্ষা করা - ৪৯
- মসজিদে ভিক্ষা করা - ৪৯
- সুস্থ ব্যক্তির ভিক্ষা করার প্রসঙ্গে - ৫০
- সন্তানদের উপর ওফাতের পর মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য - ৫০
- সন্তানদের প্রতি মাতাপিতার কর্তব্য - ৫২
- স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য - ৫৩
- দো'আ ও এর গ্রহণযোগ্যতা - ৫৪
- দো'আর উদ্দেশ্য - ৫৬
- বদ-দো'আ ও অভিসম্পাত করা - ৫৬

নিজের কৃতকর্মের চিকিৎসা নেই	-	৫৬
সৎকর্মের নির্দেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ করা	-	৫৭
কতিপয় রোগ নি'মাতই	-	৫৮
স্পিরিট কি জিনিষ?	-	৫৮
বায়'আত-এর অর্থ	-	৫৯
বায়'আত নবায়ন	-	৫৯
বায়'আত ও এর উপকারিতা	-	৬০
শাজরা শরীফ পড়ার উপকারিতা	-	৬৩
শরী'আত ও ত্বরীক্বত	-	৬৪
ইল্‌ম বিহীন সূফী	-	৬৮
দুরূদ শরীফ সংক্ষিপ্ত করা	-	৬৯
সাজদার নিশান	-	৭১
বিদ'আত কি?	-	৭২
যাদেরকে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা নিষেধ	-	৭৪
কোন্ ধরনের আংটি পরা জায়েয?	-	৭৬
নম্রতা ও কঠোরতা	-	৭৬
কালো খিযাব	-	৭৭
কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকার অর্থ	-	৭৭
তামাক ব্যবহার করা কেমন?	-	৭৮
নারীদের অলঙ্কার	-	৭৯
মুসলমানগণ কাফিরদের মেলায় যাওয়া	-	৮০
বংশ নিয়ে গর্ব-অহঙ্কার করা বৈধ নয়	-	৮১
কাউকে পেশার কারণে হীন মনে করা	-	৮২
হালালখোর মুসলমান সম্পর্কে বিধান	-	৮৩
দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া খরিদ করার অপকারিতা	-	৮৭
ওয়াযের পেশা	-	৮৭
নিফাসের দিনগুলো সম্পর্কে ভুল ধারণার অপনোদন	-	৮৯
পর্দার কয়েকটি জরুরী বিধিবিধান	-	৮৯
জরুরী, বরং অত্যন্ত জরুরী মাসআলা	-	৯০

সিনিয়র সহ-সভাপতির বক্তব্য

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আমাদের দ্বীন-ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে এ দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। পবিত্র ক্বোরআন মজীদেও এ ঘোষণা সুস্পষ্ট ভাষায় দেওয়া হয়েছে। ক্বোরআন, সুন্নাহ্, ইজমা; ও ক্বিয়াস ইসলামের চার মৌলিক দলীল। এ দলীলগুলোর ভিত্তিতে দ্বীনের মুজতাহিদগণ যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। তদুপরি, তারা এ চার দলীলের আলোকে এমনসব উসূলও কায়েম করেছেন, যেগুলোর ভিত্তিতে নতুন নতুন সমস্যাদির সমাধানও অনায়াসে পাওয়া যায়। ইসলামের প্রকৃত বিজ্ঞ ওলামা-ই কেরাম পরবর্তীতে এভাবেই যুগ জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব দিতে থাকেন। ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে মিল্লাত, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রাহমাতুল্লাহিতা'আলা আলাইহিও এমন এক বিশ্বখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব, যিনি বিভিন্নভাবে যুগ-জিজ্ঞাসার নির্ভুল সমাধান দিয়েছেন।

বলাবাহুল্য, কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের নতুন নতুন সমস্যাও দেখা দেয়। আ'লা হযরতের সম-সাময়িককালেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনিও তার অসাধারণ জ্ঞান দ্বারা হাজার হাজার সমস্যার নির্ভুল সমাধান দিয়েছেন। অতি আনন্দের বিষয় যে, তাঁর প্রদত্ত সমাধানগুলো 'ফাতাওয়া' 'আহকাম-ই শরীয়ত', ইরশাদাত' এবং 'মালফূযাত' ইত্যাদি শিরোনামে লিপিবদ্ধ হয়ে সযত্নে সংরক্ষিত হয়েছে (যেমন 'ফাতাওয়া-ই-রেযভিয়্যাহ্', 'ফাতাওয়া-ই-আফ্‌রীক্বিয়্যাহ্', 'আহকাম-ই-শরীয়ত' ও 'ইরশাদাত-ই-আ'লা হযরত' ইত্যাদি)

উল্লেখ্য, ইরশাদাত-ই-আ'লা হযরত শিরোনামের পুস্তকটি (উর্দু)-তে এমন কিছু মাসআলা-মাসাইল (যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব) সন্নিবিষ্ট হয়েছে, যেগুলো শুধু আ'লা হযরতের জীবদ্দশায় প্রযোজ্য ও সমাদৃত হয়নি, বরং আজ তাঁর ইন্‌তিকালের দীর্ঘদিন পরেও একই ধরনের সমস্যাদির যথার্থ সমাধান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তাই যুগের চাহিদা পূরণের নিমিত্ত বিশিষ্ট আলিম-ই-দ্বীন, গবেষক, লেখক ও অনুবাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান পুস্তকটির সরল বাংলায় অনুবাদ করেন, যা আমাদের 'আন্‌জুমান' গবেষণা ও প্রকাশনা পরিষদ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পুস্তিকাটি নিঃসন্দেহে উর্দুভাষীদের মতো বাংলাভাষীদেরকেও আশাতীত উপকৃত করবে-এতেই আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন
সিনিয়র সহ-সভাপতি
আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

সেক্রেটারী জেনারেলের বক্তব্য

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌, আমরা মুসলমান। সুতরাং আমাদেরকে আমাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয়কে ইসলামী অনুশাসনের সাজেই সজ্জিত করতে হবে। মুসলিম সমাজে তাই স্বভাবত ইসলামী আক্বীদা ও অনুশাসন বিরাজ করে আসছে। কিন্তু দূঃখজনক হলেও সত্য যে, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা, অজ্ঞতা ও উদাসীনতার কারণে আমাদের ইসলামী সমাজে ক্রমশঃ কিছু অনৈসলামিক ধর্ম-বিশ্বাস, কার্যকলাপ ও কুপ্রথার অনুপ্রবেশ ঘটে আসছে, যেগুলোর অপনোদন ও অপসারণ করে তদস্থলে পুনরায় ইসলামের সঠিক আক্বীদা ও সঠিক বিধানাবলী প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আজ একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী কুদ্দিসা সির্‌রুহু এ মহান দায়িত্বটি পালন করেছেন। সমাজের যেকোন বিষয়ে তাঁর নিকট সমাধান চাওয়া হতো আর তিনিও ইসলামী দলীলাদির আলোকে সমাধান প্রদান করেছেন।

সৌভাগ্যের বিষয় যে, তাঁর ওই ইরশাদ বা সমাধানরূপী অমীয় বাণীগুলো সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'ইরশাদাত-ই আ'লা হযরত' (আ'লা হযরতের কিছু বাণী) শীর্ষক এ পুস্তকে আ'লা হযরতের প্রদত্ত যুগোপযোগী বহু সমাধান বিধৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, এ কিতাবে স্থান পেয়েছে এমন কতগুলো সমাধান, যেগুলো তদানীন্তনকালে যেমন মুসলমানদের সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলো, তেমনিভাবে পরবর্তী প্রতিটি যুগেও ওইগুলো মুসলিম সমাজকে উপকৃত করে আসছে।

'ইরশাদাত-ই আ'লা হযরত' নামের মূল পুস্তকটি উর্দু ভাষায় সংকলিত, সেটার সরল বঙ্গানুবাদ করেছেন। অত্র গবেষণা ও প্রকাশনা পরিষদ-এর যুগ্ম মহাপরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান। আর আমরা সেটা প্রকাশের উদ্যোগ নিলাম। আমরা বইটির মূল সংকলক বঙ্গানুবাদক এবং এর প্রকাশনায় যারা সহযোগিতা করেছেন সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সুতরাং বইটি পাঠক সমাজের উপকারে আসলে আমাদের এ উদ্যোগ সার্থক হবে-এ প্রত্যাশাই করি।

আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

অনুবাদকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আমাদের মুসলিম সমাজে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তাই উদ্রেক হচ্ছে বিভিন্ন প্রশ্নেরও। ওইগুলোর সমাধানও তাই ইসলামের দলীলাদির আলোকে দেওয়া অপরিহার্য। এমনি অনেক প্রশ্নের সঠিক ও সমপ্রমাণ জবাব দিয়েছেন ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ওইগুলো থেকে কিছু যুগোপযুগী সমস্যার সমাধান 'ইরশাদাত-ই আ'লা হযরত' (আ'লা হযরতের কিছু বাণী) শিরোনামে বিধৃত হয়ে একটি পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বইটি সংকলন করেছেন ভারতের প্রখ্যাত আলিম-ই দ্বীন ও সুপ্রসিদ্ধ লেখক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মুবীন নু'মানী মিসবাহী সাহেব, অন্যতম কর্মকর্তা, ইসলামী কমপ্লেক্স, মুবারকপুর, আ'যমগড় (ভারত)। উর্দু ভাষায় সংকলিত পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ হয়ে প্রকাশিত হলে বাংলাভাষীগণ সহজে অনেক যুগোপযোগী সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন। এ বাস্ত বতাকে সামনে রেখে আমি কিতাবটার অনুবাদে প্রয়াসী হলাম। আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে আমি বইটার অনুবাদ সম্পন্ন করি।

অতঃপর আমি বইটি অনুদিত পাণ্ডুলিপি উপস্থপান করলে আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র গবেষণা ও প্রকাশনা পরিষদ সেটার প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বইটি বহু জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব সরবরাহ করে বাংলাভাষী পাঠক সমাজকে উপকৃত করবে-এটাই দৃঢ় আশা। আল্লাহ্‌ পাক তার হাবীবে পাকের ওসীলায় কবুল করুন, আমীন!!

অনুবাদক-

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى اله وصحبه أجمعين

আ'লা হযরতের কিছু বাণী

পূর্ণাঙ্গ ঈমান

মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রত্যেক বিষয়ে সত্য জানা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যতাকে সত্য অন্তরে মেনে নেওয়া ঈমান। যে ব্যক্তি এটা স্বীকার করলো তাকে মুসলমান জানবে। যখন তার কোন কথা, কাজ অথবা আচরণে আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করা, মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, অথবা মানহানি করা পাওয়া যাবে না। তার অন্তরে আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্পর্ক অন্য সকল সম্পর্কের চেয়ে বেশী হবে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রিয়প্রাত্রদের ভালবাসবে, যদিও নিজের শত্রু হয়, পক্ষান্তরে, সমালোচনাকারীদের সাথে শত্রুতা রাখবে, যদিও নিরেট কলিজার টুকরোও হয়, যা কিছু দান করবে আল্লাহ্র জন্য দান করবে, যা কিছু রুখবে তাও আল্লাহ্র (সন্তুষ্টির) জন্য রুখবে। তাহলে তার ঈমান পরিপূর্ণ। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান-

من أحب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان

অর্থাৎ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য ভালবাসলো, আল্লাহ্র জন্যই কারো সাথে শত্রুতা রাখলো, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করলো এবং আল্লাহ্র জন্যই হাত সংবরণ করলো, সে বাস্তবিক পক্ষে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করলো।

ঈমানের গুরুত্ব ও মূল্যায়ন

যতক্ষণ পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে না, কেউ সারা জীবন আল্লাহ্র ইবাদতে অতিবাহিত করলেও সবই অকেজো ও প্রত্যাখ্যাত হবে। অনেক সন্যাসী ও প্রাদ্রী দুনিয়া ত্যাগ করে তার নিজ নিজ ভঙ্গিতে আল্লাহ্র স্মরণ ও উপাসনায় অতিবাহিত করে; বরং তাদের মধ্যে অনেকে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু'র যিক্র শিখে এবং সেটার জপনা ও অনুশীলন করে। এতদ্সত্বেও যদি মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি সম্মান না থাকে, তবে ওইগুলো দ্বারা কি লাভ? সেগুলো মোটেই আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা তাদের সম্পর্কেই বলেছেন-

وقدمنا الى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

তরজমা : এবং যা কিছু তারা কাজ করেছিলো আমি ইচ্ছা করে সেগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ধুলিকণার বিক্ষিপ্ত অনু-পরমাণু করে দিয়েছি (২৫:২৩, তরজমা কানযুল ঈমান)। যে সকল কর্ম তারা করেছে, আল্লাহ সবগুলো নিষ্ফল করে দিয়েছেন"।[১] এমন লোকদেরই প্রসঙ্গে আরো এরশাদ করেন ঃ

عاملة ناصبة تصلى نارا حامية

তরজমা- কাজ করবে, কষ্ট ভোগ করবে, যাবে ঝলন্ত আগুনে (৮৮:৩-৪, তরজুমা কানযুল ঈমান)

হে মুসলমানরা, বলো, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ঈমান, মুক্তি ও আমল গ্রহণযোগ্য হবার ভিত্তি হলো কিনা! বলো, অবশ্যই হয়েছে।[২]

ঈমান হাক্বীক্বী ও বাস্তব হওয়া সম্পর্কে দু'টি কথা অবশ্যই রয়েছে ঃ ১. মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং ২. হুযূরের প্রতি ভালবাসাকে সমগ্র জাহানের উপর প্রাধান্য দেওয়া। এটা পরীক্ষা করার বিশুদ্ধ পন্থা হচ্ছে- যেসব লোকের প্রতি তোমার সম্মান ও ভক্তি এবং ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে, যেমন তোমার পিতা, ওস্তাদ ও সন্তান-সন্ততি, ভাই, পীর ও তোমাদের মৌলভী, হাফেয, মুফতী, ওয়াই'য ইত্যাদি, যে কেউ হোক না কেন, যখন তারা মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র মর্যাদার প্রতি বে-আদবী প্রদর্শন করে, তখন যদি তোমার অন্তরে তাদের প্রতি সম্মান এবং ভালবাসার নাম-নিশানাও না থাকে, তাৎক্ষণিকভাবে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও, দুধ থেকে মাছির মতো ছুঁড়ে মারো, তাদের চেহারা-সূরত দেখতে এবং তাদের নাম নিতেও ঘৃণাবোধ করো, অতঃপর তুমি আপন আত্মীয়তা, সম্পর্ক, ভালোবাসা ও আন্তরিকতার খেয়াল না রাখো, তাদের মৌলভীগিরি, (তথাকথিত) বুযর্গী ও ফযীলতের পরোয়া না করো, তবেই তুমি বাস্তবিকপক্ষে মু'মিন। বস্তুত ঃ এগুলোর মধ্যে যাই ছিলো, সবই মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্রই গোলামীর ভিত্তিতে ছিলো। যখন এসব লোক তাঁরই শানে বে-আদবী প্রদর্শনকারী হলো, তখন তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কই বা কিসের রইলো?

আর যদি এমনি না হয়, বরং মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মোকাবেলায় তার পক্ষপাতিত্ব করো, অথচ সে হুযূরের সাথে বে-আদবী করেছে, কিংবা তুমি তার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে নিয়েছো, কিংবা তাকে সমস্ত মন্দ থেকে মন্দতম মনে না করো, কিংবা তাকে মন্দ বলতে অপছন্দ করো, কিংবা তার প্রতি তোমার অন্তরে কঠোর ঘৃণা না আসে, তাহলে আল্লাহ্র ওয়াস্তে তুমি নিজেই ইনসাফ করে নাও যে তুমি ঈমানের পরীক্ষায় পাশ করেছো কিনা?

হে মুসলমানরা! যার হৃদয়ে মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভালবাসা থাকবে সে কি হুযূরের মানহানিকারীকে সম্মান করতে পারে? হোক না সে তার পীর কিংবা ওস্তাদ অথবা পিতা।

১। আহকাম-ই শরীয়ত, কৃত আ'লা হযরত ঃ পৃষ্ঠা ৫৭, প্রথম খণ্ড, সামনানী কুতুবখানা, মীরাঠ এবং আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ঃ পৃষ্ঠা ১৪ ঃ কিতাবুল ঈমান।

২। তামহীদ-ই ঈমান ব-আয়াত-ই ক্বোরআন ঃ কৃত আ'লা হযরত ফাযিলে বেরলভী ঃ পৃষ্ঠা ৩, বেরিলী প্রেস।

যার নিকট মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র পৃথিবী থেকে বেশী প্রিয় হয়, সে কি হুযূরের শানে বে-আদবী প্রদর্শনকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে ঘৃণা করবে না? হোক না সে তার বন্ধু, কিংবা ভাই কিংবা পুত্র।[৩]

হে ভাইয়েরা! আলিমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনতো এতদ্ভিত্তিতে ছিলো যে, তিনি নবীর উত্তরাধিকারী। নবীর উত্তরাধিকারী হচ্ছেন তিনিই, যিনি হিদায়তের উপর রয়েছেন। আর যদি কেউ পথভ্রষ্টতার উপর থাকে তবে সে কি নবীর ওয়ারিস, না শয়তানের? প্রথমোক্ত অবস্থায় তার প্রতি সম্মান দেখানো নবীর প্রতি সম্মান দেখানোর নামান্তর ছিলো, আর এ শেষোক্ত অবস্থায় তার প্রতি সম্মান দেখানো তো শয়তানের প্রতি সম্মান দেখানোর সামিল হবে; অবশ্যই লক্ষ্য করুন! এমনটি তখনই, যখন কোন আলিম কুফরের চেয়ে নিম্নতর কোন গুনাহে লিপ্ত হয়, যেমন বদ-মযহাবীদের আলিমগণ। সুতরাং তার সম্পর্কে কি বলবেন, যে নিজে জঘন্য কুফরের মধ্যে লিপ্ত? তাকে তো দ্বীনের আলিম জানাও কুফর। তাকে আলিম জেনে সম্মান করার প্রশ্নই আসে না।

হে আমার ভাইয়েরা! সহস্র-কোটি আফসোস্ ওই মুসলমান দাবী করার উপর, যেই তথাকথিত মুসলমানীতে আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহূ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা ওস্তাদের সম্মান বেশী হয়, আল্লাহ ও রসূল অপেক্ষা ভাই কিংবা বন্ধু অথবা দুনিয়ার অন্য কারো ভালবাসা বেশী হয়!

হে মহান রব! আমাদেরকে সাচ্চা ঈমান দান করো- আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রকৃত সম্মান ও সাচ্চা দয়ার বদৌলতে, আ-মী-ন।[৪]

আক্বীদার পরিপক্কতা

নাজাত একথায় সীমাবদ্ধ যে, একেকটি আক্বীদা আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আত-এর এতোই পাকাপোক্ত হবে যেন আসমান ও যমীন হেলতে পারে, কিন্তু তা হেলতে পারবে না। তারপর তার সাথে সর্বদা ভয় লেগেই থাকবে। সম্মানিত আলিমগণ বলেন, যার মধ্যে ইমান ছিনিয়ে যাবার ভয় থাকবে না, মৃত্যুর সময় তার ঈমান ছিনিয়ে যাবে।

সাইয়্যেদুনা ওমর ফারূক্ব-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "যদি আসমান থেকে আহবান করা হয় যে, সমস্ত যমীনবাসী মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এক ব্যক্তিকে, তখন আমি এ আশঙ্কা করবো যে, ওই ব্যক্তি হয় তো আমিই। আর যদি এ আহ্বান করা হয় যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠের সবাই দোযখী, কিন্তু এক ব্যক্তি, তখন আমি আশা করবো যে, ওই ব্যক্তি আমি। ভয় ও আশার স্থান এমনি মাঝামাঝি হওয়া চাই।[৫]

৩ তামহীদ-ই ঈমান ঃ পৃষ্ঠা ৬১৫

৪ তামহীদ-ই ঈমান ঃ পৃষ্ঠা ৩০ সংক্ষেপিত।

৫ আল-মালফূয ঃ ৪র্থ খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৫৫।

আহলে ক্বেবলাকে কাফির বলা নিষিদ্ধ

[আজকাল কাফির বলার মাসআলায় বিভিন্ন ধরনের বুলি আওড়ানো হচ্ছে। আর আহলে সুন্নাতের সাথে শত্রুতা পোষণকারীগণ এ মাসআলাকে এতোই ওলট-পালট করে দিয়েছে এবং এতোই ভুল রূপ দিয়েছে যে, আসল বা বাস্তবতা পর্দার একেবারে গভীরে চলে গেছে। সাধারণ তো সাধারণই, বহ শিক্ষিত মানুষও এ মাসআলার বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত নন। এ কারণে নিম্নলিখিত 'ইরশাদ' (বাণী) পেশ করা হচ্ছে, যাতে মাসআলাটার বিশুদ্ধ কাঠামো সামনে এসে যায় আর ইমাম আহমদ রেযার বিরুদ্ধে আনীত অপবাদগুলোর অসারতা জানা যেতে পারে।-সংকলক]

আমাদের আলিমগণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কারো কথার ৯৯টি ব্যাখ্যা কুফরের বের হয়, আর একটি মাত্র হয় মুসলমান হবার, তখন মুফতীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে-তিনি মুসলমান হবার ব্যাখ্যাটির প্রতি ঝুঁকবেন। **فان الاسلام يعلو ولا يعلى** অর্থাৎ তা এ কারণে যে, ইসলাম নিজে নিজেই উচুঁ এবং উচুঁ করা হয় না।

সুতরাং আমাদের ইমামগণ বলেন, **لانكفر احدا من اهل القبلة** অর্থাৎ আমরা আহলে ক্বেবলার কাউকেও কাফির বলি না।

কিন্তু এখানে এক শ্রেণীর বদ-দ্বীন মানুষ একটি জঘন্য ভুল ধারণা দিয়ে থাকে। ওই কথাগুলোকে দলিল বানিয়ে তারা দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়াদি অস্বীকারকারীদেরকেও কাফির বলার পথ বন্ধ করতে চায়; অথচ এটা খোদ্ কুফর। ওই ইমাম ও আলিমগণ, যাঁরা উপরোক্ত অভিমত লিখেছেন ও বিভিন্ন জায়গায় সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনাও করেন যে, যে ব্যক্তি দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়াদি থেকে কোন একটি বিষয়কেও অস্বীকারকারীকে কাফির বলে না জানে সে নিজেই কাফির। 'শেফা শরীফ', ইমাম কিরদারীর 'ওয়াজীয', 'দুররে মুখতার' ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য কিতাবে আছে ঃ **من شك في كفره وعذابه فقد كفر** অর্থাৎ- যে ব্যক্তি এমন লোকের কুফর ও আযাবে সন্দেহ করে, সেও কাফির হয়ে যায়)

বাকী রইলো 'এক' ও 'নিরানব্বই' ব্যাখ্যার বিষয়। এর অর্থ হচ্ছে- তার কথায় একশ'টি ব্যাখ্যা বের হয়। তন্মধ্যে ৯৯টি কুফরের দিকে যায়, আর একটি যায় মুসলমান হওয়ার দিকে, তখন তার কথাটি থেকে মুসলমান হওয়া'র অর্থটিই গ্রহণ করা ওয়াজিব। কারণ, ইসলামের অর্থের সম্ভাবনা থাকলে কুফরের সিদ্ধান্ত আরোপ করা জায়েয নয়। এর এ অর্থ নয় যে, যে ব্যক্তি ৯৯টি কুফর করবে, আর একটি মাত্র কথা ইসলামের বলবে, তাকে মুসলমান বলা হবে! অবশ্যই এটা কোন মুসলমানের ধর্ম হতে পারে না।

এমনিতে ইহুদীও আল্লাহকে এক, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম)কে নবী, তাওরীত শরীফকে আল্লাহর কালাম, ক্বিয়ামত এবং জান্নাত-দোযখকে সত্য বলে মানে। এ'তো এক নয়, শত কথা ইসলামেরই হলো, তবুও কি

তাদেরকে মুসলমান বলা যাবে? তা'ছাড়া, তাদেরকে যারা মুসলমান বলে, তারা কি কাফির হবে না? আল্লাহ্রই ওয়াস্তে লক্ষ্য করুন, বরং হাজার কথা ইসলামের বলুক, কিন্তু একটি কথা কুফরের বলা, যেমন- কেউ ক্বোরআনে আযীম তিলাওয়াত করে, নামায সম্পন্ন করে, রোযা রাখে, যাকাত দেয়, হজ্জ করে, কিন্তু সাথে সাথে মূর্তিকেও সাজদা করে, তা'হলে নিশ্চিতভাবে সে কাফির হবে।

অনুরূপ, দ্বীনের ইমামগণ ও নির্ভরযোগ্য আলিমগণ সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, 'আহলে ক্বেবলা' মানে ওইসব লোক, যারা দ্বীনের সমস্ত অপরিহার্য বিষয়ের উপর ঈমান রাখে। এমন লোকদেরকে কাফির বলা জায়েয নয়। আর যে ব্যক্তি দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়াদি থেকে একটি বিষয়কেও অস্বীকার করে, সে 'আহলে ক্বেবলা'ই নয়। সে কাফির হওয়ার মধ্যে সন্দেহ করাও অনস্বীকার্যভাবে কুফর।

শরহে মাওয়াক্বিফ, হাশিয়া-ই চিলপী, শরহে ফিক্বহে আকবার এবং দুররে মুখতারের হাশিয়া ইত্যাদিতে এর বিশ্লেষণ রয়েছে। বড় বরাত হিসেবে ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুরই দেওয়া হয় যে, তিনি 'আহলে ক্বেবলা'কে কাফির বলতেন না। এতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তিনি তাদেরকেই বলতেন না, যারা প্রকৃতপক্ষে 'আহলে ক্বেবলা'; নিছক ওইসব ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা কলেমা পড়ে এবং ক্বেবলার দিকে মুখ করে, কিন্তু স্পষ্ট কুফরী বাক্য মুখে আওড়ায়। খোদ্ সাইয়্যেদুনা ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর লিখিত আক্বাইদের কিতাব 'ফিক্বহে আকবার' শরীফে লিখেছেন ঃ

ضفاته في الازل غير محدثة ولا مخلوقة فمن قال انها مخلوقة او محدثة او وقف فيها او شك فيها فهو كافر بالله تعالى.

অর্থাৎ : আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী 'আযালী' (অনাদি), 'হা-দেস' (ধ্বংসশীল) ও সৃষ্ট নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি সেগুলোকে সৃষ্ট ও ধ্বংসশীল বলে, কিংবা সেগুলো সম্পর্কে কিছুই না বলে চুপ থাকে, কিংবা সন্দেহ করে, সে কাফির।

ইমাম আবূ ইয়ূসুফ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেন, "দীর্ঘ ছয় মাস মোনাযারা করার পর আমার ও ইমাম আবূ হানীফার রায় এর উপর স্থির হলো যে, যে ব্যক্তি ক্বোরআন-ই আযীমকে মাখলূক্ব (সৃষ্ট) বলে সে কাফির।" এ গবেষণালব্দ বিষয়গুলো খুব স্মরণ রাখার মতোই যে, নেচারী, কাফিরগণও তাদের লেজুড় ও তল্পীবাহক লোকেরা এমন স্থানে অত্যন্ত শোরগোল করে এবং নিজেরা প্রকাশ্যে কুফর করে মুসলমানদেরকে তাদেরকে কাফির বলা থেকে বিরত রাখতে চায়। আল্লাহই হিদায়তকারী।[৬]

৬ আহসানুল ভি'আ লিআ-দাবিদ্ দো'আ ঃ পৃষ্ঠা ৮৪-৮৬, দিল্লী থেকে মুদ্রিত।

৯৯টি কথা কুফরের, একটি মাত্র কথা ইসলামের

একদা আ'লা হযরতের দরবারে আরয করা হলো, "হুযূর, যার মধ্যে ৯৯টি বিষয় কুফরের থাকে, একটি মাত্র থাকে ইসলামের, তার প্রসঙ্গে কি বিধান?" তিনি বললেন, "এমন লোকটি কাফির। কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, কেউ একটা সাজদা করে আল্লাহ্কে আর ৯৯টি করে মহাদেবকে, তবুও সে মুসলমান থাকবে। কেউ ৯৯টি সাজদা করলো আল্লাহকে আর একটি মাত্র করলো মহাদেবকে, তবে সেও কাফির হয়ে যাবে। গোলাব জলে একটি মাত্র ফোঁটা প্রস্রাবের একটি মাত্র ফোঁটা মিশ্রিত করা হলে ওই গোলাবজল কি পাক থাকবে, না নাপাক? অবশ্যই নাপাক।"

ঘটনাচক্রে এক সফরে কারো উট্নী হারিয়ে গেলো। সেটার তালাশ করা হলো। হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "উট্নী অমুক জঙ্গলে আছে। সেটার নাকের রশি গাছের শিকড়ের সাথে আটকা পড়েছে।" এটা শুনে এক মুনাফিক্ব যায়দ ইবনে নুসায়ত বললো, "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন, উটনী অমুক জঙ্গলে আছে, وما يدريه بالغيب অর্থাৎ "তিনি অদৃশ্যের সংবাদ কি জানেন?" এর জবাবে আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ নাযিল করেছেন ঃ

ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون ولاتعتذروقد كفرتم بعد ايمانكم.

অর্থাৎ : এবং হে মাহবুব! যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলবে আমরা তো এমনি হাসি-খেলার মধ্যে ছিলাম। আপনি বলুন তোমরা কি আল্লাহ্ তাঁর নিদর্শনসমূহ এবং তার রাসুলকে বিদ্রূপ করছিলে? মিথ্যা অজুহাত জানিওনা! তোমরা মুসলমান হয়ে কাফির হয়ে গেছো। (৯:৬৫-৬৬, তরজমা কানযুল ঈমান)[৭]

(এখানে) আল্লাহ্ তা'আলা ৯৯ গণনা করেন নি, একটিই গণনা করেছেন। আলিমদের কথা হচ্ছে- কারো থেকে এমন কোন শব্দ বা বাক্য বের হলো, যার শত অর্থ হতে পারে, ৯৯ টার জন্য কুফর অনিবার্য হয়ে যায়, আর একটা মাত্র ইসলামের দিকে যায়, এমতাবস্থায় তার উপর কুফর আরোপ করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত একথা জানা না যায় যে, সে তার উক্তিতে কুফরের কোন অর্থ বুঝিয়েছে কিনা। মাসআলা ছিলো এটাই। আর বে-দ্বীনরা কী থেকে কী করে ফেলেছে! এর অত্যন্ত স্পষ্ট আলোচনা আমার কিতাব 'তামহীদুল ঈমান বি আয়াতিল ক্বোরআন'-এর মধ্যে রয়েছে।

৭ পারা-১০ ঃ সূরা তাওবা ঃ আয়াত- ৬৫-৬৬, তাফসীর-ই ইমাম ইবনে জরীর, মিশরে মুদ্রিত ঃ ১০ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১০৫, তাফসীর-ই দুররে মানসূর, কৃত ইমাম সুয়ূতী ঃ ৩য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ২৫৪।

এখানে একথাও বুঝা গেলো যে, যে ব্যক্তি হুযুরের অদৃশ্য জ্ঞানের অস্বীকারকারী হয়, সে কাফির হয়ে গেছে। যেই শব্দগুলো ওই মুনাফিক্ব বলেছে, যার উপর ভিত্তি করে ক্বোরআন-ই আযীম বলেছে, 'তোমরা বাহানা-অজুহাত রচনা করো না, তোমরা কাফির হয়ে গেছো ঈমানের পর', তা'তো ছিলো এ-ই- 'রসূল গায়ব কি জানেন?' উল্লেখ্য যে, মুনাফিক্ব-কাফিরদের হুবহু এ উক্তিই 'তাক্বভিয়াতুল ঈমান'-এর মধ্যে লিখেছে, 'গায়ব কী বাতেঁ আল্লাহ্ জানে, রসূলকো কেয়া খবর?' অর্থাৎ 'গায়বের খবরতো আল্লাহ্ জানেন, রসূল কি জানেন?'[৮]

তাক্বদীর কি?

তাক্বদীর কাউকে বাধ্য করে নি। একথা মনে করা নিছক ভুল ও অভিশপ্ত শয়তানেরই ধোঁকা যে, 'যেমন লিখে দিয়েছেন আমাদেরকে তেমনি করতে হয়।' না, না। এমন নয়, বরং মানুষ যেমন সম্পন্নকারী ছিলো, তেমনি প্রত্যেকের সম্পর্কে অগ্রীম লিখে দিয়েছেন। লিখা জ্ঞান অনুসারে সম্পন্ন হয়েছে। জ্ঞান জ্ঞাত বিষয়ের অনুরূপই হয়ে থাকে। জ্ঞাত বিষয়টি জ্ঞানের অনুরূপ হওয়া জরুরী নয়।

উদাহরণ স্বরূপ দুনিয়ায় পয়দা হবার পর যায়দ যিনাকারী ছিলো আর আমর নামায সম্পন্নকারী। আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা হলেন 'আ-লিমুল গায়বি ওয়াশ্ শাহাদাহ্' (অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা)। তিনি তাঁর অনাদি ও অনন্ত জ্ঞান দ্বারা তা জানেন। আর যা যে ভাবে সংঘটিত হবার ছিলো তা সেভাবে আগেভাগে লিখিয়ে নিয়েছেন। যদি পয়দা হয়ে সে তার উল্টোটাই সম্পাদনকারী হতো, অর্থাৎ আমর যিনা করতো আর যায়দ নামায পড়তো, তবে মহামহিম মুনিব তাদের এ অবস্থাদি জানতেন এবং সেভাবেই লিখতেন।

ধরে নিন, কিছুই লিখলেন না, তবুও আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা অনাদি কালে সমগ্র জাহানের সমস্ত আমল বা কর্ম, অবস্থা ও কথাবার্তা সবই নিঃসন্দেহে জানতেন। তাঁর জ্ঞানের বিপরীত সংঘটিত হওয়া সম্ভবই ছিলো না। এখন কি কোন সামান্য দ্বীনদার এবং বিবেকধারীও একথা বলবে যে, আল্লাহ্ জানতেন যে, যায়দ যিনা করবে; সুতরাং একারণেই ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে যায়দকে যিনা করতে হয়েছে? কখনো নয়, এমন কখনো নয়। নিজেই দেখছে যে, যায়দ আপন কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে যিনা করেছে, কেউ হাত-পা বেঁধে বাধ্য করে নি। তার আপন প্রবৃত্তির কামনায় এই যিনা করার কথা 'আ-লিমুল গায়ব ওয়াশ শাহাদাহ্' (দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা মহান বর)-এর অনাদি কালেই জানা ছিলো। যখন আল্লাহর ওই 'জানা থাকা' তাকে বাধ্য করে নি, তখন তা একটা 'লিপিতে নিয়ে আসা' কি তাকে বাধ্য করতে পারে? বরং যদি সে বাধ্য হয়ে যায়, তবে তো আল্লাহ্রই পানাহ্, জ্ঞান ও লিপি মিথ্যা হয়ে যাবে। কারণ, জ্ঞানে তো একথা ছিলো এবং এটাই লিপিবদ্ধ হয়েছে যে,

৮ তামহীদুন ঈমান ঃ পৃষ্ঠা ৩৩, আল-মালফূয, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯১

সে আপন কুপ্রবৃত্তির কামনায় যিনা করবে, যদি সে ওই লিপিবদ্ধ করার কারণে বাধ্য হয়ে যেতো, তবে তো সে যিনা করলো বাধ্য হয়ে, নিজের কুপ্রবৃত্তির কামনায় নয়। তাহলে, তা তো জ্ঞান ও লিপির পরিপন্থী হলো। এটা অসম্ভব।[৯]

কেউ কেউ 'তাক্বদীর'র মাসআলার উপর এভাবেও আপত্তি উত্থাপন করে যে, যখন আল্লাহ্র জানা আছে কে হিদায়ত পাবে, আর কে পাবে পথভ্রষ্টতা, তখন আপন নবীগণকে প্রেরণ করে দ্বীনের বাণী পৌঁছানোর কেন নির্দেশ দিলেন? এর পরম্পরায় এরশাদ (উত্তর)ঃ

আল্লাহ্ খুব জানেন এবং আজ থেকে নয়, বরং অনাদিকাল থেকেই জানেন-এত সংখ্যক বান্দা হিদায়ত পাবে, আর এতজন গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতায় ডুবে মরবে। কিন্তু তবুও আপন রসূলগণকে হিদায়ত করতে নিষেধ করেন নি; যাতে যারা হিদায়ত পাবার ছিলো তাদের জন্য তা হিদায়ত-প্রাপ্তির কারণ হয়ে যায়, আর যারা হিদায়ত পাবে না, তাদের বিরুদ্ধে দলীল ক্বায়েম হয়ে যায়।

মহামহিম মুনিবের এ ক্ষমতা ছিলো এবং রয়েছে কোন নবী-রসূল এবং কিতাব ছাড়াই সমগ্র জাহানকে একটি মাত্র মুহূর্তে হিদায়ত করার। এরশাদ হয়েছে-

ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلاتكونن من الجاهلين

(তরজমা এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে হিদায়তের উপর একত্রিত করতেন। সুতরাং হে শ্রোতা! তুমি কখনো মুর্খ হয়ো না।)[১০]

কিন্তু তিনি দুনিয়াকে 'দারুল আসবাব' (উপকরণের জগৎ) করেছেন। প্রতিটি নি'মাতের মধ্যে আপন পূর্ণাঙ্গ হিকমত অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অংশ রেখেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষুধাই হতো না, অথবা ক্ষুধা পেলেও কেউ তাঁর পবিত্র নাম নিলে কিংবা কোন কিছুর ঘ্রাণ নিলেই পেট ভরে যেতো। জমিতে চাষাবাদ করা থেকে রুটি পাকানো পর্যন্ত যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় তা কাউকে করতে হতো না। কিন্তু তিনি এটাই চেয়েছেন। আর তাতেও অগণিত ভিন্নতা রেখেছেন। কাউকে এতো বেশী দিয়েছেন যে, লাখো পেট তারই দরজা থেকে লালিত হচ্ছে, আর কেউ তার পরিবার-পরিজন সহকারে তিন দিন যাবৎ অনাহারে অতিবাহিত করছে।মোটকথা, প্রত্যেক কিছুর মধ্যে-

اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيٰوة الدنيا

(অর্থাৎ এবং আপনার রবের রহমত কি তারা বন্টন করে? আমি তাদের মধ্য তাদের জীবন সামগ্রী পার্থিব জীবনে বন্টন করেছি।)[১১] এর রূপ প্রস্ফুটিত হয়। বোকা, বিবেকভ্রষ্ট, কিংবা গণ্ড মূর্খ ও বদ-দ্বীন, যারা তাঁর সম্মান-সম্ভ্রম ও রহস্যাদিতে আপত্তি উত্থাপন

৯ ফাতাওয়া-ই আফ্রিক্বিয়াহ্ ঃ পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬ ঃ সামনানী প্রেস, মীরাঠ।

১০ পারা ৭ ঃ সূরা আন-আম, আয়াত-৩৫, তরজমা ঃ কানযুল ঈমান।

১১ পারা ২৫ ঃ সূরা আজযুখরুফ আয়াত -৩২, তরজমা ঃ কানযুল ঈমান।

রে বলে, "এমন কেন করলেন? এমন কেন করলেন না?" শুনো! আল্লাহর শান হচ্ছে- يفعل الله مايشآء (আল্লাহ্ যা চান করেন), তাঁর শান হচ্ছে- ان الله يحكم ما يريد (নিশ্চয় আল্লাহ্ যা চান নির্দেশ দেন), তাঁর শান হচ্ছে لايسئل عما يفعل وهم يسئلون (তিনি যা কিছু করেন তাঁকে কেউ সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারে না ; আর জবাবদিহি করতে হবে তাদের সবাইকে)।

যায়দ তার টাকায় হাজার ইট খরিদ করলো, পাঁচশ' মসজিদে লাগালো। পাঁচশ' লাগালো পায়খানার জমিতে ও রাস্তায়। সুতরাং এখন কেউ কি এ জন্য এ কথা বলতে পারে যে, এক হাতের বানানো, এক মাটি থেকে তৈরী, একই ভাটায় পোড়ানো একই টাকায় খরিদকৃত হাজার ইট ছিলো; এ পাঁচশ' ইটে কি বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, সেগুলো মসজিদে লাগালে? আর ওইগুলোতে কি দোষ ছিলো যে, সেগুলো পায়খানার আবর্জ্জনায় লাগালে? যদি কোন আহম্মক্ব তাকে জিজ্ঞাসাও করে ফেলে, তবে সে এ কথাই বলবে, "তাতে আমার মালিকানা ছিলো, তা আমার ইচ্ছা মতো ব্যবহার করেছি।" যখন রূপক ও মিথ্যা মালিকানার অবস্থা এ-ই, তখন প্রকৃত ও সত্য মালিকানা সম্পর্কে আপত্তি করার অবকাশ কোথায়? আমাদের ও আমাদের জান-মালের তিনিই একমাত্র একক ও অনন্য সত্য মালিক। তাঁর বিধানাবলীর মধ্যে কারো হস্তক্ষেপ করার অবকাশ থাকার অর্থই বা কি? কেউ কি তাঁর সমকক্ষ কিংবা তাঁর উপর কি এমন কেউ ক্ষমতা চালানোর আছে, যে তাঁকে কেন ও কি ইত্যাদি বলতে পারে? তিনি হলেন একচ্ছত্র মালিক। তাঁর মালিকানায় কারো কোন শরীক নেই। তিনি যা চেয়েছেন তা করেছেন, যা চাইবেন তা করবেন।

হীন, দীন, ব্যক্তিত্বশূন্য ও নিম্নশ্রেণীর লোক যদি বাদশার কোন কাজের বিরুদ্ধে আপত্তি করে তবে তো তার মাথা কর্তিতই হয়ে গেলো, তাকে অশুভ পরিণতিই পেয়ে বসলো। তাকে প্রতিটি বিবেকবান এ কথাই বলবে, "ওহে বিবেকভ্রষ্ট, বে-আদব! আপন সীমার মধ্যে থাক্!" যখন সন্দেহাতীতভাবে বুঝা গেলো যে, রাজাধিরাজ (আল্লাহ্) পূর্ণ ন্যায় পরায়ণ এবং সমস্ত প্রশংসায় একক ও পরিপূর্ণ, তখন তাঁর কার্যাদিতে হস্তক্ষেপ করার তোমার জন্য অবকাশ রইলো কোথায়?

گدائے خاک نشینی تو حافظا مخروش - نظام مملکت خویش خسروان داند

উচ্চারণ ঃ গাদায়ে খাক-নশীনী তূ হাফিযা! মাখরূশ
নেযামে মামলাকাতে খেশ্ খুসরুয়াঁ দানদ।
অর্থাৎ ঃ জানো হাফিয, কে তুমি? দীন-হীন খাক-নশীন!
রাজত্বের নিয়ম জানেন বাদশাহ, গদী-নশীন।

আফসোস্ ! পার্থিব রূপক ও মিথ্যা বাদশাদের সম্পর্কে মানুষ এমন ধারণা পোষণ করে

আর রাজাধিরাজ প্রকৃত বাদশাহ আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর বিধানাবলীর মধ্যে নিজের যুক্তি খাটাতে চায়! [১২]

ওযূর জরুরী মাসাইল

ওযূ করার জন্য যখন বসবেন তখন প্রথমে 'বিসমিল্লাহিল 'আলিয়্যিল 'আযীম, ওয়াল হামদু লিল্লাহি 'আলা দ্বীনিল ইসলাম ..., পড়ে নেবেন। যে ওযূ 'বিসমিল্লাহ্ সহকারে আরম্ভ করা হয়, তা সমগ্র শরীরকে পবিত্র করে দেয়। অন্যথায় যতটুক অঙ্গের উপর পানি পৌঁছবে ততটুকুই পাক করবে। তারপর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার করে এভাবে ধৌত করবে যে, প্রথমে ডান হাতকে বাম হাতে পানি ঢেলে তিন বার, তারপর ডান হাতে পানি ঢেলে বাম হাত তিন বার ধুয়ে নেবেন। তখন এ খেয়ালও রাখবেন যেন আঙ্গুলগুলোর ফাঁকগুলোতে পানি পৌঁছাতে ভুল না হয়। তারপর তিনবার কুল্লি এমনিভাবে করবেন যেন মুখের সমস্ত গোড়ায় ও দাঁতগুলোর সমস্ত ফাঁকে পানি পৌঁছে যায়। ওযূতে এমনিভাবে কুল্লি করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আর গোসলে ফরয।

বেশীরভাগ লোককে দেখেছি যে, তারা তাড়াতাড়ি তিনবার পছপছ করে নিয়েছে, কিংবা নাকের ডগার উপর তিনবার পানি লাগিয়ে নিয়েছে। এমন করলে ওযূর মধ্যেকার সুন্নাত আদায় হয় না। এক/আধবার এমন করলে 'সুন্নাত বর্জনকারী' আর অভ্যস্থ হয়ে গেলে গুনাহগার ও ফাসিক্ব হয়ে যাবে। গোসলের মধ্যে ফরয থেকে গেলে গোসলতো হয়ই না। কারণ, নাকের বাঁশীর নরম অংশ পর্যন্ত পানি চড়ানো ওযূতে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ এবং গোসলে ফরয।

দাড়ি থাকলে খুব ভালোভাবে ভিজিয়ে নেবেন। কারণ, একটা দাড়ির গোড়াও শুকনো থেকে গেলে, সেটার উপর পানি না পৌঁছলে ওযূ হবে না। আর মুখের উপর পানি দৈর্ঘ্যে কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নিচে পর্যন্ত আর প্রস্থে কানের এক লতি থেকে অপর লতি পর্যন্ত পানি প্রবাহিত করবেন।

তারপর উভয় হাতের কুনুই পর্যন্ত এভাবে ধু যেন যেন পানির ধারা কুনুই পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে গড়িয়ে যায়। এমন যেন না হয় যে, পানি কব্জি থেকে তিনবার ছেড়ে দিলেন, আর তা কুনুই পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে গেলো। এমনি করলে কুনুই, বরং কব্জির করটগুলোর উপর পানি প্রবাহিত না হবার সম্ভবনা থেকে যায়। এর প্রতি যত্নবান হওয়া জরুরী যেন একটি মাত্র লোমকূপও শুষ্ক থেকে না যায়। যদি পানি কোন লোমের গোড়াকে ভিজিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায় এবং উপরস্থ অংশ শুকনো থেকে যায়, তবে ওযূ হবে না।

১২ সালাজুস্ সদর লিঈমানিল ক্বদর ঃ মুবারকপুরে মুদ্রিত ঃ পৃষ্ঠা ৩২-৩৫

তারপর মাথার চুলগুলো মসেহ করবেন। মাথার এক চতুর্থাংশ মসেহ করা ফরয। পূর্ণ মাথা মসেহ করা সুন্নাত। উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কলেমার আঙ্গুল বাদ রেখে তিন তিনটি আঙ্গুল ও সেগুলোর মুখোমুখি পরিমাণ হাতের তালু কপালের দিক থেকে মাথার পেছনের অংশ পর্যন্ত মসেহ করে টেনে নিয়ে যাবেন। তারপর হাতের তালু দু'টির অবশিষ্ট অংশ মাথার পেছনের দিক থেকে কপাল পর্যন্ত নিয়ে আসবেন। আর কলেমার আঙ্গুলের পেট দিয়ে উভয় কানের পেটে মসেহ করবেন। তারপর বৃদ্ধাঙ্গুলি দু'টির পেট দিয়ে কান দু'টির পিঠ দু'টি মসেহ করবেন। আর দু' হাতের পিঠ দিয়ে গর্দানের পেছনের অংশ মসেহ করবেন। গলার উপর হাত আনবেন না। কারণ, এটা বিদ'আত। তারপর উভয় পা গিঠ দু'টির উপরিভাগ পর্যন্ত ধু'বেন। আর প্রতিটি অঙ্গ প্রথমে ডান ও তারপর বামটি ধু'বেন।[১৩]

একবার গ্রামাঞ্চলে যাবার সুযোগ হলো। আমার সাথে একজন আলিম ছিলেন। ফজরের নামাযের জন্য তিনি ওযূ করলেন। ভ্রূ'দুটি থেকে চেহারার উপর পানি ঢাললেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন, "তাড়াহুড়া থাকার কারণে এমনটি করলাম, যাতে ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে না যায়।" আমি বললাম, "তাহলে ওযূ ছাড়া পড়ে নিলেন না কেন?" আমার এটা খেয়াল ছিলো। যোহরের সময়ও দেখলাম। তিনি ওই ওয়াক্তেও তেমনি করলেন। আমি বললাম, "এখন তো ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো না।" আজকাল মানুষের এটা সাধারণত বদ-অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। গোসলের মধ্যে যতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিলো, ততটুকু অসতর্কতাই পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করুন![১৪]

নাকে পানি দেওয়ার নিয়ম

নাকের উভয় ছিদ্রের মধ্যে যতদূর পর্যন্ত নরম অংশ রয়েছে, অর্থাৎ শক্ত হাড়ের গোড়া পর্যন্ত ধোয়া। আর তা এভাবে হতে পারবে যে, পানি নিয়ে ঘ্রাণ নেওয়ার মতো নাকের ভিতর উপরের দিকে টানবে, যাতে ওই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। লোকেরা সেদিকে মোটেই ধ্যান দেয় না। উপরিভাগে পানি ঢালে। পানি নাকের ডগা স্পর্শ করে নিচে পড়ে যায়। নাকের ছিদ্রের ভিতর যত নরম জায়গা রয়েছে, ওই সব ক'টি ধোয়া তো বড় কথা। এটা তো প্রকাশ্য কথা যে, পানির গতি নিচের দিকে থাকে। উপরের দিকে চড়ানো ব্যতীত চড়বে না। আফসোস্! সাধারণ তো সাধারণই। কোন কোন পড়ালেখা করেছে এমন লোকও এ বালায় লিপ্ত রয়েছে। ওযূর মধ্যে তো কোন মতে চলে। কারণ, তা বর্জন করায় অভ্যস্থ হয়ে গেলে সুন্নাত বর্জনের গুনাহ্ হবে, কিন্তু গোসল তো মোটেই হবে না-

১৩ আল-মালফুয ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৮৮ ঃ সামনানী প্রেস থেকে মুদ্রিত।

১৪ আল-মালফুয ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৯০।

যতক্ষণ পর্যন্ত গোটা মুখ ও কণ্ঠনালী পর্যন্ত, নাকের ছিদ্রের সমগ্র নরম অংশ ও সেটার শক্ত হাড়ের গোড়া পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গভাবে ধুয়ে ফেলা না হয়। এমনকি আলিমগণ বলেন, নাকের ভিতর ময়লা জমে থাকলে প্রথমে সেটা সাফ করে নেয়া অপরিহার্য। অন্যথায় সেটার নিম্নভাগে পানি অতিক্রম না করলে গোসলই হবে না। এ সতর্কতা থেকে রোযাদারও রেহাই পাবে না। অবশ্য, এর উপরে পানি চড়ানো (তার জন্য) উচিত হবে না; কারণ এর ফলে পানি মাথায় মগজ পর্যন্ত চড়ে যাবার সম্ভাবনা থকে। রোযাদার নয় এমন লোকের জন্য এটাও সুন্নাত।

'মাদ্‌মাদ্বাহ্' বা কুল্লি করার নিয়ম

'মাদ্‌মাদ্বাহ্' মানে সমগ্র মুখ, সেটার কোণায় কোণায়, প্রতিটি অংশে, কণ্ঠনালীর সীমানা পর্যন্ত ধোয়া। আজকাল অনেক জ্ঞানহীন লোক এ 'মাদ্‌মাদ্বাহ্'র অর্থ করে 'নিছক কুল্লি করা'। তারা কিছু পানি মুখে নিয়ে মুখ থেকে ফেলে দেয়, যা জিহ্বার গোড়া ও কণ্ঠনালীর কিনারা পর্যন্ত পৌঁছে না। এমনি অবস্থায় গোসল করার অপরিহার্যতা আদায় হবে না, না এমন গোসল দ্বারা নামায হতে পারে, না মসজিদে যাওয়া জায়েয হবে; বরং ফরয হচ্ছে চিবুক যুগলের পেছনে মুখ গহবরের নিম্নভাগে, দাঁতগুলোর গোড়ায়, দাঁতগুলোর জানালাগুলোতে, কণ্ঠনালীর কিনারা পর্যন্ত প্রতিটি অংশে পানি প্রবাহিত করা। এমনকি যদি ছিলকা কিংবা এমন কোন শক্ত জিনিষ, যা পানি প্রবাহিত হওয়ার অন্তরায় হয়ে দাঁতগুলোর গোড়া কিংবা ফাঁকগুলোর মধ্যে বাধ সাধে, তাহলে সেটা সরিয়ে দিয়ে কুল্লি করা অপরিহার্য। অন্যথায় গোসল হবে না। অবশ্য যদি সেটা সরিয়ে নিতে তার কোন ক্ষতি, অসুবিধা কিংবা কষ্ট হয়, যেমন বেশী পরিমাণ পান খাওয়ার কারণে দাঁতগুলোর গোড়ায় গোড়ায় চুনা জমে এমনই শক্ত হয়ে যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা বেশী হয়ে নিজ জায়গা থেকে খসে না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তা অপসারণের উপযোগী থাকে না, অথবা কারো দাঁতে তামাক জাতীয় বস্তু জমে যায়, যা অপসারণ করতে গেলে দাঁতের বা দাঁতের মাড়ির ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত এমন অবস্থা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই পরিমাণের জন্য শিথিল তথা ক্ষমাযোগ্য হবে। গোসলের বেলায় রোযাদারদের জন্যও এসব সতর্কতা অবলম্বন না করে উপায় নেই। অবশ্য তার জন্য গারগারাহ্ জরুরী নয়, কারণ কখানো যেনো পানি কণ্ঠনালীর নিচে নেমে না যায়। যারা রোযাদার নয় তাদের জন্য গারগারাহ্ করাও সুন্নাত।

পানি প্রবাহিত করা

(এর অর্থ গোসলের মধ্যে এ যে,) মাথার চুল থেকে পায়ের তালুর নিম্নভাগ পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ও লোমকূপের বাইরের অংশের উপর পানি এমনভাবে প্রবাহিত

হওয়া যেন তা ফোঁটা ফোঁটা হয়ে টপকে পড়ে, এমন স্থান বা অবস্থা ব্যতীত, যা'তে কোন অসুবিধা থাকে, যার বর্ণনা সহসা আসছে। লোকেরা এখানে দু'ধরনের অসর্তকতা অবলম্বন করে, যার ফলে গোসল আদায় হয় না এবং নামাযগুলো নিষ্ফল হয়ে যায় ঃ

প্রথমত ঃ 'গাস্‌ল'- এর অর্থ বুঝতে ভুল করা। কোথাও কোথাও তেলের মতো মালিশ করে নেওয়া কিংবা ভেজা হাত বুলিয়ে নেয়াকেই যথেষ্ট মনে করে বসে। অথচ এটা হলো মসেহ। গোসলে কিন্তু পানির ফোঁটা টপকে পড়া জরুরী। যতক্ষণ পর্যন্ত একেকটা কণা পরিমাণ জায়গার উপর দিয়ে পানি বয়ে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত গোসল অবশ্যই হবে না।

দ্বিতীয়ত ঃ পানিকে এমনই বে-পরোয়াভাবে প্রবাহিত করে যে, কোন কোন অঙ্গ একেবারেই শুষ্ক থেকে যায়। কিংবা সেগুলো পর্যন্ত কিছুটা প্রভাব পৌঁছলে, তা ভেজা হাতের প্রভাব মাত্র। তাদের ধারণায় হয়তো পানির মধ্যে এমন কারামতাদি রয়েছে যে, তা প্রতিটি কোণায় ও নীরব জায়গায়ও নিজে নিজে দৌড়ে পৌঁছে যায়, তাতে বিশেষ কোন প্রকার সতর্কতার প্রয়োজন হয় না। অথচ প্রকাশ্য অঙ্গেও এমন অনেক স্থান রয়েছে, যেখানে শরীরের একাংশ অপর অংশের মধ্যে গোপন হয়ে আছে, অথবা পানির চলাচলের পথ থেকে এমন আলাদা যে, বিশেষ সতর্কতা ব্যতীত পানি সেটার উপর পৌঁছানোর কল্পনাও করা যায় না। আর বিধান হচ্ছে- যদি বিন্দু পরিমাণ জায়গা কিংবা কোন লোমের অগ্রভাগও পানি প্রবাহিত না হয়ে থেকে যায়, তবে গোসল হবে না। তাছাড়া, শুধু গোসলে নয়, বরং ওযূতেও এমনি অসতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। কখনো পায়ের মুড়ির উপরের অংশে পানি প্রবাহিত হয় না, কখনো কুনুইযুগলের উপর, কখনো (মুখ ধোয়ার সময়) মাথায় উপরিভাগে, কখনো কর্ণযুগলের নিকট কানের গোড়ায়। আমি এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ কিতাব লিখেছি। তাতে ওইসব স্থানের বিস্তারিত বিবরণ সতর্কতার পদ্ধতিগুলোর বিশ্লেষণ সহকারে এমনি সহজ ও সুস্পষ্টভাবে দিয়েছি, যা আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যক্রমে, প্রতিটি স্বল্পশিক্ষিত, ছোট ছেলে এবং মেয়েলোকও বুঝতে পারবে।[১৫]

গোপনাঙ্গ দেখলে ওযূ ভঙ্গ হয় না

নিজের কিংবা অন্য কারো গোপনাঙ্গ দেখলে মোটেই ওযূর ক্ষতি হয় না। এ মাসআলা (গোপনাঙ্গ দেখলে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার ধারণা) সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল প্রসিদ্ধ হয়েছে। অবশ্য, অন্য কারো গোপনাঙ্গ স্বেচ্ছায় দেখা হারাম। যদি স্বেচ্ছায় দেখে তবে নামায মাকরূহ হবে।[১৬]

১৫ তিবইয়ানুল ওযূ

১৬ ফাতাওয়া-ই আফরীক্বিয়াহ্, পৃষ্ঠা ৯০, সামনানী কুতুবখানা, মীরাঠ।

ক্বাযা নামায সম্পন্ন করার পদ্ধতি

সাবধান! যিক্‌র ও অন্যান্য পুণ্যময় কার্যাদিতে মাশগুল হবার পূর্বে যদি ক্বাযা নামায কিংবা রোযা থাকে, তবে সেগুলো সম্পন্ন করে নেওয়া যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়, অত্যন্ত জরুরী। যার উপর ফরয বাকী থেকে যায়, তার নফল ও মুস্তাহাব কার্যাদি উপকারে আসে না, বরং ক্ববূল হয় না- যতক্ষণ পর্যন্ত না ফরযগুলো সম্পন্ন করে নেবে।[১৭]

ক্বাযা নামাযগুলো যথাশীঘ্র আদায় করে নেওয়া অপরিহার্য। কারণ, কখন মৃত্যু এসে যাবে তা জানা নেই। মুশকিলের কি আছে? এক দিনে মাত্র বিশ রাক্'আত হয়ে থাকে। (অর্থাৎ ফজরের দু'রাক'আত ফরয, যোহরের চার রাক'আত, আসরের চার রাক'আত, মাগরিবের তিন রাক'আত এবং এশা ও বিতরের মোট সাত রাক'আত।) এ নামাযগুলোকে সূর্যোদয়, সূর্য স্থির হওয়া ও সূর্যাস্তের সময় ব্যতীত সব সময় পড়া যায়। (কারণ, এ তিন ওয়াক্বতে সাজদা করা হারাম।) এতেও ইখতিয়ার আছে যে, প্রথমে ফজরের সব ক্বাযা নামায আদায় করে নেবে, তারপর যোহরের, তারপর আসরের, তারপর মাগরিবের এবং তারপর এশা ও বিতরের কিংবা সব নামায সাথে সাথে আদায় করতে থাকবেন। আর সেগুলোর এমনিভাবে হিসাব নির্ণয় করবেন যেন অনুমাণে কোন নামায বাদ না পড়ে। বেশী হলে কোন ক্ষতি নেই। ওই সব নামায সাধ্যানুসারে, ক্রমশঃ নিয়মিতভাবে আদায় করতে থাকবেন, আলস্য করবেন না। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত ফরয নিজ দায়িত্বে বাকী থেকে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নফল ক্ববূল হয় না। নিয়্যত ওই সব নামাযের এভাবে হবে- যেমন শতবারের ফজরের ক্বাযা রয়েছে। তাহলে প্রত্যেকবার এভাবে বলবেন, "সর্বপ্রথম যেই

নামায আমার দায়ীত্বে ক্বাযা রয়েছে সেটার নিয়্যত করছি।" প্রত্যেক বার এটাই বলবেন। অর্থাৎ যখন একটা সম্পন্ন হয়ে গেলো, তখন অবশিষ্টগুলোর মধ্যে যা সর্বপ্রথম হয় সেটার নিয়্যত হয়ে গেলো। এমনিভাবে যোহর ইত্যাদি নামাযে নিয়্যত করবেন।

যার দায়িত্বে বহু নামায ক্বাযা হয়ে যায়, তার জন্য সহজ ও তাড়াতাড়ি আদায় করার পদ্ধতি হচ্ছে- 'খালি রাক্'আতগুলোতে' (যেমন, যোহর ও আসর ইত্যাদির প্রথম ক্ব'দার পরবর্তী রাক'আতগুলো, যেগুলোতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হয়) 'আলহামদু শরীফ'-এর পরিবর্তে একবার 'সুবহানাল্লাহ্' বলবেন। তাহলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। তাছাড়া, তাসবীহ্গুলো রুকূ' ও সাজদার মধ্যে শুধু একেকবার করে পড়বেন। অর্থাৎ 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম', 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা শুধু একেকবার পড়ে নেওয়া যথেষ্ট। 'তাশাহ্হুদ' (আত্তাহিয়্যাত)-এর পর উভয় দুরূদ শরীফের স্থলে 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আ-লিহী', বিতরগুলোতে 'দো'আ ক্বুনূত'-এর পরিবর্তে 'রাব্বিগ্‌ফিরলী' বলা যথেষ্ট। সুর্যোদয়ের বিশ মিনিট পর আর সুর্যাস্তের বিশ মিনিট পূর্বে নামায সম্পন্ন করবে।

১৭ আল-ওয়াযীফাতুল করীমাহ ঃ পৃষ্ঠা ১৮, রেযভী কুতুবখানা, বাহাদুর পুর, বেরিলী। এমন প্রতিটি লোক, যার

দায়িত্বে নামাযসমূহ বাকী রয়ে গেছে, সে যেন তা গোপন রেখে সম্পন্ন করে। কারণ, গুনাহ্‌র কথা ঘোষণা করা জায়েয নয়। (এর ধারাবাহিকতায় এরশাদ ফরমায়েছেন-)

"যদি কারো দায়িত্বে ৩০ কিংবা ৪০ বছরের নামায সম্পন্ন করা অপরিহার্য থেকে যায়, সে ওই কাজগুলো ব্যতীত, যেগুলো না করলে উপায় নেই, কাজ-কারবার বাদ দিয়ে আরম্ভ করলো, আর পাকাপাকি ইচ্ছা করে বসলো যে, সমস্ত নামায সম্পন্ন না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবেন না, মনে করুন, ওই অবস্থায় এক মাস কিংবা একটি মাত্র দিনের পর তার ইন্তিকাল হয়ে গেলো, তখন আল্লাহ তা'আলা আপন পূর্ণাঙ্গ রহমত দ্বারা তার সমস্ত নামায 'সম্পন্ন করেছে' বলে গণ্য করে নেবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه
الموت فقد وقع اجره على الله (الجزء ٥: الركوع ١١)

তরজমা ঃ যে ব্যক্তি আপন ঘর থেকে আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে হিজরত বের হয়েছে, তারপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসেছে, তবে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র বদান্যতার দায়িত্বে এসে গেছে।[১৮]

এখানে শর্তহীনভাবে এরশাদ করেছেন, "ঘর থেকে যদি একটি মাত্র ক্বদম পরিমাণ বের হয়, আর তখনি তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে, তবে পূর্ণ কাজটি তার আমলনামায় এসে যাবে এবং সে পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব পাবে। ওখানে আল্লাহ্ তা'আলা নিয়্যতই দেখেন। পুরোটাই নিয়্যতের উপর নির্ভর করে।[১৯]

নামাযের কিছু জরুরী বিধান

১. মানুষ যখন নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, তখন মনের ধ্যান-ধারণা যা বদ্ধমূল ছিলো, তা বিদ্যুতের চমকের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে চায়। তখন যদি তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তবে তা পুনরায় গোছানো মুশকিল হয়ে যায়। সুতরাং চোখ খুলতেই প্রথম কাজ এটাই করবেন যে, নিজ খেয়ালকে নিবদ্ধ রেখে ধ্যানে তিনবার, কলেমা তাইয়্যেবা لا اله الا الله محمد رسول الله (صلى الله تعالى عليه وسلم) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাম) পড়ে নেবে। এই আরম্ভ যদি তার ধারণায় বদ্ধমূল হয়, তবে সারাদিন এর বরকত তার পুরো খেয়ালকে ঘিরে থাকবে।
২. নামাযের মধ্যে নাভীর নিচে হাত মজবুতভাবে বাঁধতে হবে। নাফসের খনি হচ্ছে নাভীর নিম্নভাগ। এখান থেকে কুপ্ররোচনা ওঠে আর ক্বলবের মধ্যে যায়।

১৮ পারা-৫ ঃ সুরা নিসা আয়াত-১০০, তরজমা কানযুল ইমান

১৯ আল-রেযা, কাশফুল ফক্বীর ক্বাদেরীর বরাতে ঃ পৃষ্ঠা ৪১-৪৩ ঃ হাসানী প্রেস, সওদাগরাঁ, বেরিলী।

এ কারণে শাফে'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মাযহাবের কোন কোন ইমাম ক্বলবের নিচে পেটের উপর হাত বাধেঁন, যাতে দুশমনের রাস্তা রুখতে পারেন। আমাদের (হানাফী মাযহাবের) ইমামগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমা'ঈন) নাভীর নিচে হাত বাঁধেন, যাতে কুপ্ররোচনার উৎসস্থলের গোড়ায় বাধা সৃষ্টি হয়ে যায়। হাত যদি কখনো ঢিলা হয়ে যায়, তবে যেনো সাথে সাথে পুনরায় শক্ত করে নেওয়া হয়।

৩. দৃষ্টির স্থানগুলো, যেগুলো শরীয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তাতে উদ্দেশ্য হচ্ছে খেয়ালে যেনো পেরেশানী না আসতে পারে। এর উপর জোর দেওয়া জরুরী। ক্বিয়ামে দৃষ্টি থাকবে সাজদার স্থানে, রুকূ'তে থাকবে পায়ের উপর, ক্বু'উদ বা বৈঠকে কোলের উপর আর সালামে থাকবে কাঁধের উপর।
৪. কান আপন আপন আওয়াজে ভর্তি থাকবে। (অর্থাৎ যা কিছু পড়বে তাতে এতটুকু আওয়াজ হওয়া জরুরী যেনো নিজ কানে শুনতে পায়।)
৫. পড়ার মধ্যে তাড়াতাড়ি করা চাই। কারণ, অলসভাবে আস্তে আস্তে তথা ঢিলা দিয়ে যা পড়া হয় তাতে খেয়াল-খুশী তার বিক্ষিপ্ততার ময়দানকে প্রশস্ত পায়। আর যখন তাড়াতাড়ি একের পর এক করে শব্দগুলো পড়ে নেওয়া হয় এবং শুদ্ধভাবে পড়ার প্রতিও যত্নবান হওয়া যায়, তবে খেয়াল ওই দিক থেকে মুক্তি পাবে।
৬. একটা বড় মূলনীতি হচ্ছে-মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রতিটি জোড়া ও প্রতিটি শিরা নম্র ও ঢিলা থাকবে এবং ধারণা নিচের দিকে ঝুঁকে থাকবে। হাত উপরের দিকে এমনভাবে তুলে ধরবে না, যাতে স্কন্ধযুগল উপরের দিকে উঠে যায়। পাঁজরের হাড়গুলো যেনো শক্ত হয়ে না থাকে। শরীরের এ গড়নও বিভিন্ন সময়ে বদলে যাবে। সতর্ক থাকবে যেন বদলে যেতেই তাৎক্ষণিকভাবে ঠিক করে নেওয়া যায়। এর এ অর্থ নয় যে, ক্বিয়ামে ঝুঁকে দাঁড়াবে, কিংবা রুকূ'তে মাথা নিচু থাকবে, কিংবা সাজদায় কব্জি অথবা বাহু কিংবা রান অস্বাভাবিকভাবে থাকবে। কারণ, এটা নিষিদ্ধ, বরং মনোনিবেশকালে প্রতিটি অঙ্গ যমীনের দিকে ঝুঁকে থাকবে, টেনে-খিচে থাকবে না, নম্রভাবে থাকবে। আর এটা অভিজ্ঞতা থেকে প্রকাশ পাবে। যেভাবে বলা হয়েছে-সেভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অল্পক্ষণ পরে দেখবে যে, পাছা শক্ত হয়ে গেছে, কাঁধ ও পাঁজরগুলো উপরের দিকে চড়ে গেছে বলে মনে হবে। মনের ধারণা ঠিক করতেই তা ব্যতীত শরীরকে একটু নাড়া দেবে। তখন মনে হবে যেনো সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিচে নেমে এসেছে এবং মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে।
৭. যদি নামাযের যিকরগুলোর অর্থ জানা থাকে, তাহলে ভালো। অন্যথায় মনের কল্পনাকে এভাবে বদ্ধমূল রাখবে-'আমি মহান রবের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বিনয় ও অপারগতা প্রকাশ করছি।' আর কান্নার ভঙ্গিতে মুখকে বানিয়ে নেওয়া এর জন্য সহায়ক হবে। যখন এমন অবস্থা তৈরী হবে, তখনই মনোনিবেশ করে মুখ বানিয়ে নেবে। সাথে সাথে খেয়াল বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।
৮. যে প্ররোচনাগুলো আসবে সেগুলো দূর করার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ওই লড়াইয়ে

জড়িয়ে পড়ার মধ্যেও শয়তানের উদ্দেশ্য হাসিল হয়। অর্থাৎ নামাযী তো নামায থেকে গাফিল হয়ে অন্য কাজে মশগুল হয়ে গেলো; বরং সাথে সাথে আপন খেয়ালকে ওদিক থেকে আপন রবের সামনে বিনয়ের দিকে ফিরিয়ে আনবে। আর প্ররোচনাগুলোকে এমনি মনে করবে যেন 'অন্য কেউ আবোল-তাবোল বকাবকি করছে। তার সাথে আমার কোন কাজ নেই।' যদি বেশী গণ্ডোগোল করে, তবে ওই বিনয়ের মধ্যে আপন রবের দরবারে ফরিয়াদ করবে। এতে নিয়ম হচ্ছে-আল্লাহকে স্মরণ করতেই তা পালিয়ে যায়।

অতি সহজ পন্থা হচ্ছে- পেট না খালি রাখবে, না ভর্তি। যদি এতোই খালি থাকে যেন ক্ষুধা যন্ত্রণা দেবে, তবে তাও ক্ষতিকর হবে। ভর্তি থাকলে ক্ষতির তো ইয়ত্তাই নেই। এক তৃতীয়াংশ ভর্তি পেটই হচ্ছে-উত্তম ও শ্রেষ্ঠ পেট।[২০]

প্রথম কাতারের ফযীলত

হাদীস শরীফে এরশাদ করা হয়েছে-যদি লোকেরা জানতো প্রথম কাতারে নামায পড়লে এতো বেশী সাওয়াব রয়েছে, তাহলে অবশ্যই সেটার জন্য তারা লটারী দিতো। অর্থাৎ প্রত্যেকে প্রথম কাতারে দাঁড়াতে চাইতো। আর স্থান সঙ্কুলান না হবার কারণে লটারী দিয়ে তার মীমাংসা করা হতো। সর্বপ্রথম ইমামের উপর আল্লাহ্‌র রহমত অবতীর্ণ হয়। তারপর প্রথম কাতারে যে ব্যক্তি ইমামের সোজাসুজি পেছনে দাঁড়ায় তার উপর, তারপর ওই সোজাসুজি পেছনে দণ্ডায়মান ব্যক্তির ডান পার্শ্বস্থ মুসাল্লীর উপর, তারপর বাম পার্শ্বস্থের উপর, তারপর ডানদিকে, তারপর বাম দিকে। এভাবে দ্বিতীয় কাতারে প্রথমে ইমামের সোজাসুজি লোকটির উপর, তারপর ডানে, তারপর বামে। এভাবে সর্বশেষ কাতার পর্যন্ত।[২১]

জমা'আত সহকারে নামাযের ফযীলত

শরীয়তের প্রবক্তা অর্থাৎ সরকারে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমা'আতের উপর এতো বেশী তাকিদ দিয়েছেন যে, একজন অন্ধ লোক হুযূরের মহান দরবারে হাযির হলেন। আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমার এমন কেউ নেই, যে আমাকে হাতে ধরে মসজিদে নিয়ে আসবে। আমাকে ঘরে নামায পড়ে নেওয়ার অনুমতি দান করা হোক!" হুযূর অনুমতি দিলেন। লোকটি যখন কিছুদূর চলে গেলেন, তখন হুযূর পুনরায় তাকে ডাকলেন। এরশাদ ফরমালেন, "তুমি কি আযানের আওয়াজ শোনে থাকো?" আরয করলেন, "হাঁ।" এরশাদ ফরমালেন, "তুমি হাযির হয়ে যেও!"

২০ কাশকূল ফক্বীর ক্বাদেরী ঃ ৪৩-৪৫।

২১ আল-মালফূয ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৮৫।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাও অন্ধ হওয়ার কারণে ওযরসম্পন্ন ছিলেন। তিনিও হাযির হয়ে আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! মদীনা তাইয়্যেবায় সাপ, বিচ্ছু ও নেকড়ে বাঘ অনেক। আমার জন্য কি ঘরে নামায পড়ে নেয়ার অনুমতি আছে?" এরশাদ ফরমালেন, "তুমি কি হাইয়্যা 'আলাস্ সালাত', হাইয়্যা আলাল ফালাহ্'র আওয়াজ শোনে থাকো?" আরয করলেন, "হাঁ। এরশাদ ফরমালেন, "তাহলে হাযির হও।"

অন্ধ। না অনুমান করতে পারে, না কেউ নিয়ে যাবার রয়েছে। বিশেষ করে যখন সাপ-বিচ্ছুর ভয় থাকে। কিন্তু হুযূর তাঁদেরকে উত্তম কাজটি করার হিদায়ত করেছেন, যাতে ওইসব লোক তা থেকে সবক নিতে পারে, যারা কোন ওযর ছাড়াই ঘরে নামায পড়ে নেয় এবং মসজিদে হাযির না হয়ে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় পড়ে। কারণ, হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন- ان تركتم سنة نبيكم لضللتم وفى ابي داؤد لكفرتم (যদি তোমরা আপন নবীর সুন্নাত ছেড়ে দাও তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আবূ দাউদ শরীফে আছে, অবশ্যই তোমরা কুফরই করবে।) মহান আল্লাহরই আশ্রয়![২২]

জমা'আত ছেড়ে দেওয়ার শরীয়তসম্মত ওযরসমূহ

সব সময় স্মরণ রাখার যোগ্য যে, আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালনের জন্য সামান্য কষ্ট কখনো ওযর হতে পারে না। ওযর হচ্ছে অধিক কষ্টই।

যদি রাত এতো বেশী অন্ধকার হয় যে, মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা দেখা যায় না, হয় তো ভোরে কালো মেঘ ছেয়ে যাবার কারণে, নতুবা কখনো কালো মেঘ অতিক্রম করার কারণে এমন অন্ধকার ছেয়ে গেলে তা জমা'আতে হাযির না হবার জন্য ওযর হিসেবে গণ্য হয়।[২৩]

চেরাগ ও লণ্ঠন যোগাড় থাকলে, যা মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, কিংবা যোগাড় করতে অসুবিধা না হয়, যেমন-তেল ও দিয়াশলাই মওজুদ রয়েছে, তাহলে যতো আঁধারই হোক না কেন, জমা'আত ত্যাগ করার জন্য ওযর হতে পারে না।

যার নিকট আলোর ব্যবস্থা নেই, যেমন একটা মাত্র চেরাগ আছে, আর ঘরে আছে পরিবারের অন্যান্য সদস্য। এটা যদি মসজিদে নিয়ে যায়, তবে তারা ঘরে কোন কাজ করতে পারবে না, অথবা শিশুরা অন্ধকারে ভয় পাবে, অথবা মহিলা ঘরে একা। তাকে একা রেখে গেলে সে ভয় পাবে। এসব অবস্থায় এবং ওই ঘন-ভয়ানক অন্ধকার, যাতে মসজিদের পথ দেখা যায় না, জমা'আত ছেড়ে দেওয়ার ওযর হিসেবে গণ্য হবে।

২২ ফাতাওয়া-ই রেযভিয়াহ্ ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৬৩৩ ঃ বেরিলী থেকে মুদ্রিত।

২৩ প্রাগুক্ত ঃ পৃষ্ঠা নং ৬৩২।

বস্তুতঃ অন্ধকারে মসজিদে যাওয়ার বড় ফযীলত রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন ঃ

بشر المشآئين فى الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة
(ابو داود والترمذى وابن ماجة وحاكم)

অর্থাৎ- যেসব লোক অন্ধকারে মসজিদে হাযির হওয়ায় অভ্যস্থ হয় তাদেরকে ক্বিয়ামত-দিবসে পূর্ণাঙ্গ নূরের সুসংবাদ দাও। [২৪]

যে ব্যক্তি মসজিদে যেতে পারে না, যেমন-পঙ্গু-খোঁড়া, কিংবা এমন অবশ রোগী অথবা একেবারে দুর্বল বৃদ্ধ, যে চলতে পারে না, অন্ধ যে অনুমান করতে পারে না, রাতকানা কিংবা কোমরের ব্যাথার কারণে চলতে পারে না, তাদের উপর জুমু'আহ্ ও জমা'আত ওয়াজিব নয়। [২৫]

ওযূ, গোসল ও সাজদাহ্র মধ্যে আম-খাস লোকদের অসর্তকতাসমূহ

ওযূ ঃ ওযূতে কুনুইযুগল, পায়ের দু'মুড়ি এবং কব্জি দু'টির কোন কোন লোমের অগ্রভাগ বেশীরভাগ সময়ে শুষ্ক থেকে যায়। আর এটা তো আম বালা হয়ে গেছে যে, মুখ ধোয়ার সময় পানি মাথার নিম্নভাগের উপর ঢেলে দেয়, আর উপরে ভেজা হাত বুলিয়ে দেয়। এতে মাথার উপরিভাগের উপর মসেহ্ হলো, ধোয়া হলো না। অথচ ফরয হচ্ছে ধোয়া। ফলে না ওযূ হলো, না নামায।

গোসল ঃ গোসলের মধ্যে ফরয হচ্ছে পানি নাকের ছিদ্র দিয়ে উপরে টেনে নাকের নরম হাড় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া। যাচাই করে দেখুন কয়জন লোকই এমন করে। অঞ্জলীতে পানি নিলো আর নাকের ডগায় লাগালো। ব্যাস্, নাকে পনি দেওয়া হয়ে গেলো! ফলে সে সব সময় নাপাকই রয়ে গেলো। তার জন্য তো মসজিদে যাওয়াও হারাম। নামায তো দূরের কথা।

সাজদা ঃ সাজদায় ফরয হচ্ছে- কমপক্ষে পায়ের এক আঙ্গুলের পেট যমীনে লাগানো থাকবে এবং প্রতিটি পায়ের বেশীরভাগ আঙ্গুলের পেট যমীনের উপর স্থির থাকা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে নাকের হাড় যমীনের উপর লাগানো ওয়াজিব। অনেক লোকের নাক যমীনের সাথে লাগেই না; লাগলেও লেগে থাকে নাকের অগ্রভাগ মাত্র।

২৪ আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও হাকিম। ফাতাওয়া-ই রেযভিয়াহ ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৬৩৩ (সংক্ষেপিত)।
২৫ ফাতাওয়া-ই রেযভিয়াহ্ ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৬৩৬।

এখানে ওয়াজিব বর্জন করার কারণে গুনাহ্ এবং তাতে অভ্যস্থ হবার কারণে ফাসেক্বী হলো। পাগুলো দেখুন, আঙ্গুলগুলোর মাথা যমীনের উপর থাকে বটে, কিন্তু কোন আঙ্গুলের পেট বিছানো অবস্থায় থাকে না। এমতাবস্থায় সাজদাহ্ বাতিল, নামাযও নিষ্ফল। অথচ মুসাল্লী সাহেব নামায পড়ে ঘরে চলে গেলেন।[২৬]

'ক্বিরআত'-এ অসর্তকতাসমূহ

ক্বিরআত ঃ দেখুন, এতটুক তাজভীদ সহকারে ক্বোরআন পাঠ করা, যাতে একটা বর্ণ অন্য বর্ণ থেকে বিশুদ্ধভাবে পার্থক্য করা যেতে পারে, 'ফরয-ই আইন'। এটা ব্যতীত নামায নিশ্চিতভাগে বাতিল। সাধারণ বেচারদের কথা বাদই দিন, খাস লোক বলে দাবীদারদেরকে দেখুন, কতজন এ কাজটি ঠিক মতো সম্পন্ন করে? আমি
আপন চোখে দেখেছি এবং আপন কানে শুনেছি। কাদেরকে? আলিমদেরকে, মুফতীদেরকে, ধর্মীয় শিক্ষকদেরকে, লেখকদেরকে। তারা **قل هو الله أحد** -এর স্থলে পড়ছেন **أهد** জুমা'আর মধ্যে **عليهم يحسبون كل صيحة** -এর স্থলে পড়ছেন **وهو العزيز الحكيم افاعذرهم** এর স্থলে পড়েছেন **هم العدو فاحذرهم ؛ يهسبون** এর স্থলে পড়ছেন **هو العذيذ**। বরং এক সাহেবকে **الحمد** শরীফে **صراط الذين** -এর স্থলে **صراط الظين** পড়তেও শুনেছি। কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন? এমন অবস্থাতো বহু শীর্ষস্থানীয়দের, সাধারণ বেচারাগণ কাদের মধ্যে গণ্য?

শরীয়ত কি তাদের বে-পরোয়া কাজগুলোর কারণে নিজ বিধান রহিত করে দেবে? না, না।

ان الحكم الا لله ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
والله سبحانه وتعالى اعلم

অর্থাৎ ঃ নির্দেশ তো আল্লাহ্রই। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি কিন্তু সুউচ্চ মহান আল্লাহ্রই দানক্রমে। পবিত্র মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।[২৭]

নফল নামাযসমূহে রুকূ'র অবস্থা

আরয ঃ নফল নামাযসমূহের মধ্যে রুকূ' কিভাবে করা চাই? যদি বসে পড়ে, তবে কিভাবে?

এরশাদ ঃ এতটুকু ঝুঁকবেন যেন মাথা হাঁটুদ্বয়ের বরাবর হয়ে যায়। আর যদি দাঁড়িয়ে পড়েন, তবে পায়ের গোছাগুলো যেনো ধনুর মতো বাঁকা না হয়।

২৬ ফাতাওয়া-ই রেযভিয়াহ্ ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৫৫৫।
২৭ ফাতাওয়া-ই রেযভিয়াহ্ ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৫৫৫ ঃ বেরিলীতে মুদ্রিত।

আর হাতের তালুদু'টিকে হাঁটুযুগলের উপর স্থির করবেন। হাতের আঙ্গুলগুলো যেনো পরস্পর আলাদা থাকে।

এক ব্যক্তিকে আমি দেখেছি, রুকূ'র অবস্থায় পিঠকে একেবারে সোজা রেখেছেন, মুখকে তুলে রেখেছেন। যখন তিনি নামায সমাপ্ত করলেন, তখন তাঁকে বলা হলো- "আপনি এটা কি ধরনের রুকূ, করলেন? বিধান তো এমনি যে, ঘাড়কে এতটুকু ঝুঁকাবেন যেমন ভেঁড়া ঝুঁকায়, আর না এতটুকু উপরে উঠাবেন যেমন উট উঠিয়ে থাকে।" ওই সাহেব বলতে লাগলেন, "মুখ এজন্য উঠিয়ে রেখেছিলাম যেন তা ক্বেবলার দিক থেকে অন্যদিকে ফিরে না যায়।" আমি বললাম, "তাহলে আপনি হয়তো সাজদাও থুতনীর উপর করে থাকেন?" সে ব্যাপারটা বুঝে গেলো এবং ভবিষ্যতের জন্য শুধ্‌রে গেলো।[২৮]

নামাযের গুরুত্ব

নামাযকে লোকেরা সহজ মনে করে নিয়েছে। সাধারণ লোকেরা কাদের গণনায়? কোন কোন বড় আলেম বলে দাবীদার, অথচ তাদের নামায বিশুদ্ধ হয় না। ইবাদত নিছক আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হওয়া চাই। কখনো আপন আমলের উপর অহঙ্কার করবে না। কারণ, কারো সারা জীবনের নেক কার্যাদি আল্লাহ্‌র একটি মাত্র নি'মাতের, যা তিনি তাকে নিজ করুণায় দান করেছেন, বিনিময় হতে পারে না।[২৯]

দ্বিতীয় জমা'আত চলাকালে সুন্নাত পড়া

আরয ঃ দ্বিতীয় জমা'আত যখন আরম্ভ হয় তখন যোহরের সুন্নাত পড়া যায়েয হবে কি না? অথবা ফজরের সুন্নাত দ্বিতীয় জমা'আতের আখেরী বৈঠক পাওয়া না গেলেও ছেড়ে দেওয়া যাবে কি না?

এরশাদ ঃ দ্বিতীয় জমা'আত শুধু জায়েয। তজ্জন্য সুন্নাত ছেড়ে দেবেন না। মূল নামায তো প্রথম জমা'আতেই হয়, যার জন্য হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, "যদি ঘর-বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে ও মহিলা না থাকতো, তবে আমি যেসব লোক জমা'আতে শরীক হয় না, তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিতাম।[৩০]

২৮ প্রথম মালফূয ঃ পৃষ্ঠা ৮৩।
২৯ ২য় খণ্ড মালফূয ঃ পৃষ্ঠা ৮৩।
৩০ আল-মালফূয ঃ ৩য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১৪।

জানাযা নামাযের কাতারসমূহ

আরয ঃ জানাযার নামাযে তিনটি কাতার করার ফযীলত রয়েছে। এর নিয়মাবলী সম্পর্কে 'দুররে মুখতার' ও 'কবীরী'তে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, প্রথম কাতারে তিনজন, দ্বিতীয় কাতারে দু'জন এবং তৃতীয় কাতারে একজন দণ্ডায়মান হবে। এর কারণ কি? প্রতিটি কাতারে দু'জন করেও দাঁড়াতে পারতো?

এরশাদ ঃ সবচেয়ে কম পরিমাণ পূর্ণাঙ্গ কাতার হয় তিনজন লোক দ্বারা। এ কারণে প্রথম কাতার পূর্ণাঙ্গ করে দেওয়া হলো। আর এর দলীল হচ্ছে-ইমামের পাশাপাশি দু'জন লোক দাঁড়ানো মাকরূহ-ই তানযীহী। আর তিনজনলোক দাঁড়ানো মাকরূহ-ই তাহরীমী। কেননা কাতার পূর্ণাঙ্গ হবার মতো লোক হাযির আছে। আর এমতাবস্থায় ইমামের কাতারে দাঁড়ানো হলো। তাছাড়া, পাঁচ ওয়াক্বতের নামাযেও কোন কোন অবস্থায় একাকী দা'ডানো না জায়েয নয় (সুতরাং সর্বশেষ একজন দাড়িয়ে কাতার তাই সম্পন্ন হল)।[৩১]

ফজরের সুন্নাত কখন পড়বেন?

আরয ঃ ফজরের সুন্নাত কি ওয়াক্বতের প্রারম্ভে পড়বেন? না ফরযের অব্যবহিত পূর্বে?
ইরশাদ ঃ ওয়াক্বতের প্রারম্ভে পড়ে নেওয়া উত্তম। হাদীস শরীফে আছে- যখন মানুষ শয়ন করে তখন শয়তান তিনটি গিরা বাঁধে। যখন ভোরে উঠতেই কেউ মহামহিম রবের নাম নেয়, তখন একটা গিরা খুলে যায়, ওযূ করে নিলে দ্বিতীয় গিরা খুলে যায় এবং যখন সুন্নাত নামাযগুলোর নিয়্যত বেঁধে নেয়, তখন তৃতীয়টাও খুলে যায়। সুতরাং ওয়াক্বতের প্রারম্ভে সুন্নাত পড়ে নেওয়া উত্তম।[৩২]

সালামের পর ডানে ও বামে ফিরে বসা

আরয ঃ সালামের পর ইমামের পাঁচ ওয়াক্বত নামাযের মধ্যে কি ডানে-বামে ফিরে দো'আ করা চাই, না শুধু ফজরে ও আসরে?
এরশাদ ঃ কোন নামাযেই ইমামের মোটেই উচিত হবে না (সালামের পর) ক্বেবলামুখী হয়ে বসে থাকা। নিঃশর্তভাবে ফিরে যাওয়া জরুরী। 'যখীরাহ' ও 'হিলইয়াহ্' ইত্যাদি কিতাবে এমনি লিখা হয়েছে সুস্পষ্টভাবে।[৩৩]

৩১ আল-মালফূয ঃ ৩য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১৪।
৩২ আল-মালফূয ঃ ৩য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৩০।
৩৩ ফাতাওয়া-ই রেযভিয়াহ্ ঃ ৩য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৭৪ ঃ মুবারকপুরে মুদ্রিত।

মসজিদের আদাব বা নিয়মাবলী

১. মসজিদে ই'তিকাফের নিয়্যত ব্যতিরেকে কোন জিনিষ খাওয়ার অনুমতি নেই। অনেক মসজিদে নিয়ম করে নেওয়া হয়েছে যে, রমযানুল মুবারকে লোকেরা নামাযীদের জন্য ইফতারী পাঠায়। তারাও ই'তিকাফের নিয়্যত ছাড়াই নির্দ্বিধায় সেখানে পানাহার করে থাকে এবং মসজিদের বিছানা নষ্ট করে। এটা না জায়েয।

২. মসজিদের এক স্তর থেকে অপর স্তরে প্রবেশের সময় ডান পা বাড়ানো উচিত। এমনকি যখন সফ্ বিছানো থাকে, তাহলে সেটার উপরও প্রথমে ডান পা রাখুন। আর যখন সেখান থেকে সরে যান, তখনও ডান পা মেঝের উপর রাখুন। অথবা খতীব যখন মিম্বরের উপর যাবার ইচ্ছা করেন, তখন প্রথমে ডান পা রাখবেন, আর যখন নামবেন তখন প্রথমে ডান পা নামাবেন।

৩. ওযূ করার সময় ওযূর অঙ্গগুলো থেকে পানির একটা ছিঁটকেও যেনো মসজিদের ফরশ বা মেঝের উপর না পড়ে।

৪. মসজিদে দৌঁড়ানো কিংবা সজোরে কদম রাখা, যা থেকে বিকট শব্দ পয়দা হয়, নিষিদ্ধ।

৫. মসজিদে দুনিয়ার কোন কথা বলবে না। অবশ্য, কোন দ্বীনী কথা যদি কারো সাথে বলতে হয়, তাহলে তার নিকটে গিয়ে আস্তে আস্তে বলা চাই। এমনিভাবে বলবে না, যেমন একজন লোক মসজিদে দাঁড়িয়ে অন্য এক পথিকের সাথে, যে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে, উচ্চস্বরে কথা বলে থাকে, না এমনিভাবে যেমন কেউ বাইরে থেকে ডাকছে, আরেকজন মসজিদের ভিতর থেকে তাকে উচ্চস্বরে জবাব দিচ্ছে।

৬. মসজিদের ফরশের উপর কোন কিছু সজোরে নিক্ষেপ করা যাবে না, বরং আস্তে আস্তে রাখতে হবে। গরমের মৌসুমে লোকেরা হাতপাখা নাড়তে নাড়তে তা সজোরে নিক্ষেপ করে। কিংবা কাঠ বা লাঠি রাখার সময় দূর থেকে ছেড়ে দিয়ে থাকে। এটা নিষিদ্ধ। মোটকথা, মসজিদের প্রতি সম্মান দেখানো প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

৭. ক্বেবলার দিকে পা প্রসারিত করা সর্বত্র নিষিদ্ধ। মসজিদে কারো দিকে পা প্রসারিত করবে না। কারণ, তা মজলিস বা দরবারের আদবের পরিপন্থী। হযরত ইব্রাহীম আদহাম কুদ্দিসা সির্‌রুহু একদা মসজিদে একাকী উপবিষ্ঠ ছিলেন। পা প্রসারিত করে দিলেন। মসজিদের এক কোণ্ থেকে অদৃশ্য আহ্বানকারী আওয়াজ দিয়ে বললেন, "ইব্রাহীম! বাদশাহ্‌র দরবারে কি এভাবে বসে?" সাথে সাথে তিনি তাঁর পদযুগল গুটিয়ে নিলেন এবং এমনিভাবে গুটালেন যে, ইন্‌তিকালের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আর কোন দিন পা প্রসারিত করে বসেন নি, বরং ইনতিকালের পরই তাঁর পা দু'টি প্রসারিত করা হয়েছিলো।

৮. মসজিদের ভিতরে এখানকার (হিন্দুস্থানের) কোন কাফিরকে প্রবেশ করতে দেওয়া কঠোরভাবে অবৈধ এবং তা মসজিদের অবমাননাও। ফিক্বহ্ শাস্ত্রে জায়েয বলে অনুমতি দেওয়া হলেও তা দেওয়া হয়েছে যিম্মীদের জন্য, এখানকার (হিন্দুস্থানের) কাফির- যিম্মীদের জন্য নয়; অথচ এ কেমনই যুল্‌ম যে, তারা তোমাদেরকে নিম্নশ্রেণীর মেথরের মতো মনে করে! যে জিনিষের উপর তোমাদের হাত লেগে যায়, সেটাকে তারা নাপাক মনে করে। সওদা দিলে তাও দূর থেকে ঢেলে দেয়! পয়সা নিতে হলে আলাদা স্থানে রাখিয়ে নেয়। অথচ তারা যে নাপাক সে কথার উপর ক্বোরআন সাক্ষী- انما المشركون نجس (নিশ্চয় মুশরিকগণ জঘন্য নাপাক)।[৩৪]
সুতরাং তোমরা কিভাবে ওইসব নাপাককে তোমাদের মসজিদে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারো? তাহলে তো তারা তাদের নাপাক পা তোমাদের মাথা রাখার জায়গায় রাখবে, তাদের নাপাক দেহ নিয়ে তোমাদের মহান রবের দরবারে আসবে! আল্লাহ্ হিদায়ত দিন![৩৫]

ওরস ও নারীদের উপস্থিতি

আরয ঃ হুযূর! বুযর্গানে দ্বীনের কোন কোন ওরসে যেসব অবৈধ কাজ হচ্ছে, সেগুলোর কারণে কি ওই সব হযরতের কষ্ট হয়?
এরশাদ ঃ নিঃসন্দেহে ওইসব হযরতের কষ্ট হয় এবং এর কারণে ওইসব হযরত এদিকে মনোনিবেশও কম করেন। অন্যথায় ইতোপূর্বে যে পরিমাণ ফয়য পাওয়া যেতো, ততটুকু বর্তমানে কোথায়?[৩৬]

ইমাম ক্বাযীকে জিজ্ঞাসা করা হলো-নারীদের জন্য কবরস্তানে যাওয়া জায়েয হবে কিনা? তিনি বললেন, "এমন জায়গায় বৈধ কিংবা অবৈধের কথা জিজ্ঞাসা করার অবকাশই নেই, বরং জিজ্ঞাসা করো-এতে নারীদের উপর কতোটুকু লা'নত আপতিত হয়!

১. যখন নারীরা ঘর থেকে কবরগুলোর দিকে চলতে আরম্ভ করে, তখন থেকে তারা আল্লাহ্ ও ফিরিশ্‌তাদের লা'নতের মধ্যে থাকে।
২. যখন তারা ঘর থেকে বাইরে যায় তখন সব দিক থেকে শয়তান তাদেরকে ঘিরে ফেলে।
৩. যখন কবর পর্যন্ত পৌছে, তখন মৃতের রূহ তাদেরকে লা'নত করে।
৪. যখন ফিরে আসে তখনো তারা আল্লাহ্‌র লা'নতে থাকে।[৩৭]

৩৪ পারা ১ ঃ রুকূ'১০, অনুবাদ কানযুল ঈমান।
৩৫ আল-মালফূয ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১১২।
৩৬ আল-মালফূয ঃ ৩য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৪৬।
৩৭ ফাতাওয়া-ই রেযাভিয়াহ্ ঃ ৪র্থ খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১৭৩ ঃ মুবারকপুর থেকে মুদ্রিত।

উল্টো দিক থেকে সূরা পড়ার ওযীফা!

আরয ঃ কোন কোন ওযীফায় (দৈনন্দিন পাঠের দীক্ষায়) আয়াত ও সূরাগুলোকে উল্টো দিক থেকে পড়তে লিখা হয়েছে। এর বিধান কি?

এরশাদ ঃ হারাম ও জঘন্য হারাম, কবীরাহ্ ও মারত্মক কবীরাহ্, কুফরের কাছাকাছি। আয়াতগুলোকে উল্টিয়ে দেওয়াতে অতিজঘন্য কথা, সূরাগুলো শুধু বিন্যাসকে উল্টিয়ে দিয়ে পড়া সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এমনি যে করে তার কি এ ভয় নেই যে, কখনো তার ক্বলবকে উল্টিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি না?" আয়াতগুলোকে একেবারে উল্টো করে অর্থহীন করে দেওয়ার বিষয়টি তো আরো বেশী মারাত্মক।[৩৮]

ক্বলব ও নাফ্স 'ক্বলব'প্রকৃত অর্থে নিছক গোশতের ওই টুকরোর নাম নয়, বরং তা হচ্ছে একটি অদৃশ্য সুক্ষ্ম বস্তুর নাম, যার কেন্দ্র হচ্ছে ওই গোশতের টুকরো, বক্ষের বাম পাশে। আর নাফসের কেন্দ্র হচ্ছে নাভীর নিম্নভাগে।

এ কারণে শাফে'ঈগণ বক্ষের উপর হাত বাঁধেন, যাতে নাফ্স থেকে যেসব প্ররোচনা ওঠে সেগুলো ক্বলব পর্যন্ত পৌছতে না পারে। আর হানাফীগণ হাত বাঁধে নাভীর নিচে।

কবি বলেন-

سرچشمہ باید گرفتن بہ بیل
چون برشد گرفتن نشاید بہ بیل

উৎসস্থলকে খুব আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করা চাই। যখন তা সঠিকভাবে গ্রহণ করা হয় তখন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে না।

ক্ষতিকর বিড়ালকে প্রথম দিনেই হত্যা করতে হয়। এ জন্যই লিখা হয়েছে যে, যদি নামাযে হাত শক্ত করে বাঁধা হয়, তবে কুপ্ররোচনা পয়দা হয় না।[৩৯]

মহর পরিশোধ করা

আরয : যে ব্যক্তি মহর ক্বুবূল করার সময় খেয়াল করে, 'কে পরিশোধ করে? এখন ক্বুবূল করে নাও, পরে দেখা যাবে।' এমন লোক সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?

এরশাদ ঃ হাদীসে পাকে এরশাদ হয়েছে যে, এমন নারী ও পুরুষ যিনাকারী ও যিনাকারীনী হিসেবে ওঠবে। [৪০]

৩৮ আল-মালফূয ঃ ৩য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ২২।
৩৯ আল-মালফূয ঃ ৩য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৬৩।
৪০ আল-মালফূয ঃ ৩য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১৫।

আহারের আদাব বা নিয়মাবলী

খানা খাওয়ার সময় কথা না বলা নিজের উপর অপরিহার্য করে নেওয়া অগ্নি-পূজারীদের বদ-অভ্যাস এবং মাকরূহ আর অনর্থক কথাবার্তা বলাও তো সব সময় মাকরূহ। অবশ্য যিকর ও ভালো কথা আলোচনা করা যায়েয।[৪১]

আরয ঃ খানা খাওয়ার সময় প্রারম্ভে 'বিস্মিল্লাহ্' পড়ে নেওয়া যথেষ্ঠ কিনা?
এরশাদ ঃ হাঁ, যথেষ্ঠ। 'বিস্মিল্লাহ্' ছাড়া আরম্ভকৃত খানায় শয়তান শরীক হয়ে যায়।
আরয ঃ দস্তরখানার উপর যদি কবিতা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে সেটার উপর খানা খাওয়া জায়েয কিনা?
এরশাদ ঃ না জায়েয।
খানা খাওয়ার সময় জুতা খুলে ফেলা সুন্নাত। দারমী, আবূ ইয়া'লা ও হাকিম বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

اذا اكلتم الطعام فاخلعوا نعالكم فانه اروح لاقدامكم وانها سنة جميلة.

অর্থাৎ ঃ যখন খানা খাওয়ার জন্য বসবে, তখন জুতা খুলে নাও। তাতে তোমাদের পদযুগলের জন্য বেশী আরাম রয়েছে। আর নিশ্চয় এটা উত্তম সুন্নাতও।

শির'আতুল ইসলাম নামক কিতাবে আছে-

يخلع نعليه عند الطعام অর্থাৎ- খানা খাওয়ার সময় জুতো খুলে ফেলবে।

জুতো পরে খানা খাওয়া যদি এ ওযরের কারণে হয় যে, মাটির উপর বসে খানা খাচ্ছে, কোন ফরশ বা বিছানো নেই, তখন তো একটা মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাতকে বর্জন করা হয়। তজ্জন্য জুতো খুলে ফেলাই উত্তম ছিলো। যদি টেবিলের উপর খানা থাকে, আর আহারকারী জুতো পরে চেয়ারের উপর বসে, তবে তা তো হলো খ্রিস্টানদের কু-প্রথা। তা থেকে দূরে পালাবে। আর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এরশাদকে স্মরণ করবেঃ

من تشبه بقوم فهو منهم অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য অবলম্বনকরে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত।[৪২]

৪১ আল-মালফূয ঃ ৪র্থ খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১৫।

৪২ আহমদ, আবূ দাউদ, আবূ ইয়া'লা, তাবরানী, দুররে কবীর ও আওসাত্ব) [ফাতাওয়া-ই আফ্রীক্বিয়াহ্ ঃ পৃষ্ঠা ৩৭]

খানা খাওয়ার পর বর্তন লেহন করে খাওয়া সুন্নাত

কতিপয় হাদীসের অনুবাদ ঃ

১. সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙ্গুলগুলো ও রেকাবী (বর্তন) লেহন করে খেতে হুকুম দিতেন। আর এরশাদ করতেন, "তোমরা কি জানো খাদ্যের কোন্ অংশটিতে বর্‌কত রয়েছে?" অর্থাৎ- হয়তো বরকত ওই অংশের মধ্যে রয়েছে, যা আঙ্গুলগুলো ও বর্তনের সাথে লেগে রয়েছে।

২. মুসলিম, আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে খানা খেয়ে পাত্র ভালোভাবে পরিস্কার করে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (আর এরশাদ ফরমায়েছেন-) "কারণ, তোমরা কি জানো তোমাদের কোন্ খাবারের মধ্যে বরকত রয়েছে?"

৩. আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ নুবাইশাতুল খায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "যে কেউ পেয়ালায় আহার করে জিহ্বা দিয়ে সেটাকে সাফ করে নেয়, ওই পেয়ালা তার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করে।"

৪. ইমাম হাকিম, তিরমিযী এ বিষয়বস্তুতে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, "এবং ওই পেয়ালা তার জন্য দুরূদ প্রেরণ করে।"

৫. দায়লামীর বর্ণনায় রয়েছে, এরশাদ করেছেন, "ওই পেয়ালা এভাবে বলে- হে আল্লাহ্! তাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো, যেভাবে সে আমাকে শয়তান থেকে রক্ষা করেছে।" অর্থাৎ পেয়ালা বা বর্তনকে পরিস্কার করে না খেয়ে রেখে দিলে শয়তান সেটা লেহন করে।

৬. হাকিম, ইবনে হিব্বান ও বায়হাক্বী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, "খানা খেয়ে বর্তন উঠাবে না, যতক্ষণ না সেটা নিজে লেহন করে খেয়ে নেবে, অথবা (উদাহরণ স্বরূপ, কোন শিশু কিংবা সেবককে দিয়ে) চাটিয়ে নেবে। কারণ, খাদ্যের সর্বশেষ অংশে বরকত রয়েছে।"

৭. 'মুসনাদ-ই হাসান ইবনে সুফিয়ান'-এ রাইত্বাহ্‌র পিতা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "পেয়ালা লেহন করে খাওয়া আমার নিকট সেটা ভর্তি করে দান করার চেয়েও বেশী প্রিয়।" অর্থাৎ লেহন করে খাওয়ার মধ্যে যেই বিনয় প্রকাশ পায়, সেটার সাওয়াব ওই সাওয়াব অপেক্ষা বেশী।

৮. 'মু'জাম-ই কবীর'-এ হযরত 'ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়াহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি রেকাবী (আহারের বড় পাত্র) ও আপন আঙ্গুলগুলো লেহন করে খাবে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার পেট ভরবেন।" অর্থাৎ দুনিয়ায় পরমুখাপেক্ষিতা ও অনাহার-অর্ধাহার থেকে রক্ষা পাবে আর ক্বিয়ামতের ক্ষুধা থেকে মুক্ত থাকবে, দোযখ থেকে রেহাই দেওয়া হবে। কারণ, দোযখে কারো পেট ভরবে না। তাতে এই খাদ্য রয়েছে- لايسمن ولايغني من جوع والعياذ بالله تعالى অর্থাৎ- না পুষ্টি আনবে, না ক্ষুধায় কোন কাজে আসবে। মহান আল্লাহ্‌রই পানাহ্ প্রার্থনা করছি।[৪৩]

প্রত্যেকটি দানার উপর সেটার আহারকারীর নাম লিপিবদ্ধ থাকে

'যারক্বানী 'আলাল মাওয়াহিব'- এর মধ্যে বর্ণিত, প্রতিটি দানার উপর কুদরতের কলম দিয়ে এতটুকু ইবারত লিপিবদ্ধ থাকে- بسم الله الرحمن الرحيم هذا رزق فلان بن فلان অর্থাৎ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, এটা অমুকের পুত্র অমুকের রিয্‌ক্ব।" ওই দানা সে ব্যতীত অন্য কারো পেটে যেতে পারে না।

আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী বান্দা বলছে যে, বহু দানা এমনই হতে পারে যে, আটা পিষ্ট হয়ে সেটার এক অংশ এক রুটিতে গেছে, যা যায়দ খেলো, আর কিছু গেলো অন্য রুটিতে, যা আমর আহার করলো। তখন এমন দানার এ অংশের উপর যায়দের নাম তার পিতার নাম সহকারে লিপিবদ্ধ থাকে আর ওই অংশের উপর আমরের। এভাবে যদি ওই দানা চার ব্যক্তির মধ্যেও বন্টিত হয়, তবে ওই চার অংশের উপর চার ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ থাকে। আর কিছু দানা আছে, যা এমনিতেই বিনষ্ট হয়ে যায়। সেগুলোর উপর কারো নাম লিপিবদ্ধ থাকে না। فسبحن القدير على مايشآء عز جلاله وعم نواله অর্থাৎ সুতরাং পবিত্রতা ওই মহা ক্ষমতাবানের, যিনি যা চান করতে পারেন, তাঁর মহত্ব সবার উপরে এবং তাঁর করুণা ব্যাপক।

'আহমদ' ও 'মুহাম্মদ' নামের ফযীলতসমূহ

কেউ আরয করলো, "আমার ভাতিজা পয়দা হয়েছে। তাঁর কোন ঐতিহাসিক নাম ঠিক করে দিন!" তখন আ'লা হযরত কুদ্দিসা সির্‌রুহূ এরশাদ করলেন "ঐতিহাসিক নাম দিলে কি লাভ হবে? নাম ওইগুলো থেকে রাখা হোক,

৪৩ ফাতাওয়া-ই রেযভিয়াহ্ ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ২৪৩।

যেগুলোর ফযীলতসমূহ হাদীস শরীফে এসেছে। আমার ও আমার ভাইয়ের যতো সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, আমি সবার নাম 'মুহাম্মদ' রেখেছি। তাছাড়া, এ নামটি ঐহিসাহিকও।[৪৪]

'মুহাম্মদ' ও 'আহমদ' নামের ফযীলত প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীস শরীফ

১। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ سموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي অর্থাৎ "তোমরা আমার নামে নাম রাখো, আমার 'কুনিয়াত' (উপনাম) রেখো না।"

২. হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, আর সে আমার প্রতি ভালবাসা ও আমার পবিত্র নামের বরকত হাসিল করার জন্য তার নাম 'মুহাম্মদ' রাখে, সে ও তার পুত্র উভয়েই বেহেশতে যাবে।"[৪৫]

৩. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, ক্বিয়ামত-দিবসে দু'ব্যক্তিকে আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যাতের মহান দরবারে দাঁড় করানো হবে। নির্দেশ দেওয়া হবে- 'তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাও!' তারা আরয করবে, "হে আল্লাহ্! আমরা কোন্ আমলের বিনিময়ে জান্নাতের উপযোগী হয়েছি?" "আমরা তো বিশেষ কোন কাজ জান্নাত পাবার মতো করি নি!" মহামহিম রব এরশাদ করবেন, 'জান্নাতে যাও! আর আমি ক্বসম করেছি যে, যার নাম আহমদ কিংবা মুহাম্মদ হবে সে দোযখে যাবে না।'[৪৬]
অর্থাৎ যখন মু'মিন হবে। আর ক্বোরআন, হাদীস ও সাহাবা-ই কেরামের পরিভাষায় মু'মিন তাকেই বলে, যে সুন্নী, বিশুদ্ধ আক্বীদায় বিশ্বাসী হয়। যেমন, 'তাওযীহ্' ইত্যাদি কিতাবে ইমামগণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। অন্যথায় বদ-মাযহাবী ভ্রান্ত আক্বীদাসম্পন্ন লোকদের সম্পর্কে তো হাদীসসমূহ এরশাদ করছে যে, তারা জাহান্নমের কুকুর। তাদের কোন আমল ক্বুবূল হয় না। বদ-মাযহাব যদিও হাজর-ই আসওয়াদ ও মাক্বাম-ই ইব্রাহীমের মধ্যভাগে মযলূম অবস্থায় নিহত হয়, আর সেও এ নিহত হবার উপর ধৈর্য ধারণ করে এবং সাওয়াবের আকাঙ্কা পোষণ করে, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তার কোন কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[৪৭]

৪৪ আল-মালফূয ঃ খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১৯।
৪৫ হাফেয আবূ তাহের সালাফী ও ইবনে বুকয়র।
৪৬ হাফেয আবূ তাহের সালাফী ও ইবনে বুকয়র।
৪৭ দার-ই কুত্বনী, ইবনে মাজাহ্, বায়হাক্বী ইত্যাদি।

৪. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার মহামহিম রব আমাকে এরশাদ করেছেন, "আমার ইয্যাত ও মহত্বের শপথ, যার নাম আপনার নাম অনুসারে রাখা হবে, তাকে দোযখের আযাব দেবো না।[৪৮]

৫. আমীরুল মু'মিনীন হযরত মাওলা আলী কার্‌রামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহুল করীম থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে দস্তরখানার উপর লোকেরা বসে আহার করে, আর তাদের মধ্যে কেউ 'মুহাম্মদ' কিংবা 'আহমদ' নামের থাকে, তাদেরকে প্রত্যেহ দু'বার পবিত্র করা হবে।"[৪৯] মোটকথা, যে ঘরে ওই পাক নাম দু'টির কেউ থাকে, দিনে দু'বার ওই ঘরে আল্লাহর রহমত নাযিল হবে।

৬. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে কার কি অসুবিধা আছে, যদি তার ঘরে একজনের নাম 'মুহাম্মদ', দু'জনের নাম 'মুহাম্মদ', কিংবা তিনজনের নাম 'মুহাম্মদ' হয়?"[৫০]
এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলার রহমতে, এ ফক্বীর, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন, আপন সব পুত্র ও ভাতিজাদের আক্বীক্বায় শুধু 'মুহাম্মদ' নাম রেখেছি। তারপর পবিত্রতম এ নামের হিফাযত ও আদব রক্ষার্থে এবং পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য পৃথক পৃথক ডাকনাম নির্দ্ধারণ করেছি। মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসাক্রমে, আমার এখানে 'মুহাম্মদ' নামের পাঁচজন মওজূদ রয়েছে।

৭. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন কোন সম্প্রদায় কোন পরামর্শের জন্য একত্রিত হয়, আর তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি 'মুহাম্মদ' নামের থাকে এবং তাকে নিজেদের পরামর্শে শরীক না করে, তাহলে তাদের ওই পরামর্শের মধ্যে কোন বরকতই রাখা হবে না।"[৫১]

৮. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যার তিনটি পুত্র সন্তান পয়দা হয়, আর সে তাদের মধ্যে কারো নাম মুহাম্মদ রাখলো না, সে অবশ্যই মূর্খ।"[৫২]

৪৮ হুলিয়া-ই আবূ নু'আঈম।
৪৯ হাফিয ইবনে বুকায়র, দায়লামী, মুসনাদ-ই আবূ সা'ঈদ নক্বক্বাশ [ইবেন 'আদী কামিল]
৫০ তাবাক্বাত-ই ইবেনে সা'দ।
৫১ ত্বারাইফী, ইবনে জওযী।
৫২ তাবরানী, কবীর।

৯. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি পুত্র সন্তানের নাম 'মুহাম্মদ' রাখো, তবে তার প্রতি সম্মান দেখাও, মজলিসে তার জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দাও, তাকে কোন মন্দের সাথে সম্পৃক্ত করো না, কিংবা তার জন্য মন্দ দো'আ করো না।"[৫৩]

১০. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে পুত্র সন্তানের নাম 'মুহাম্মদ' রাখবে, তাকে না মারধর করবে, না বঞ্চিত করবে।[৫৪]

উত্তম হচ্ছে এটাই যে, শুধু 'মুহাম্মদ' কিংবা 'আহমদ' নাম রাখবেন। সেটার সাথে 'জান' ইত্যাদি অন্য কোন শব্দ সংযোজিত করবেন না। কারণ, ফযীলতসমূহ তো শুধু বরকতময় নাম দু'টিরই বর্ণিত হয়েছে।[৫৫]

হুযূরের পাদুকা শরীফের নক্শার বরকতসমূহ

ওলামা-ই কেরাম বলেছেন ঃ

১. যার নিকট এ নকশা মুবারক থাকবে সে যালিমদের যুল্‌ম, শয়তানদের অনিষ্ট এবং হিংসুকদের যখমকারী দৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকবে।

২. গর্ভবতী নারী প্রসব-বেদনার সময় যদি তা আপন ডান হাতে নেয়, তবে সহজে সন্তান প্রসব করবে।

৩. যে সব সময় সাথে রাখবে সে আল্লাহ্‌র কৃপাদৃষ্টিতে সম্মানিত থাকবে।

৪. রওযা-ই মুক্বাদ্দাসের যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করবে; কিংবা স্বপ্নে হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাত পেয়ে ধন্য হবে।

৫. যে সৈন্যদলের মধ্যে থাকবে ওই দল পলায়ন করবে না।

৬. যে কাফেলায় থাকবে তা লুণ্ঠিত হবে না।

৭. যে নৌযানে থাকবে তা ডুববে না।

৮. যে মালের মধ্যে থাকবে তা চুরি হবে না।

৯. যে প্রয়োজনে সেটাকে ওসীলা বা মাধ্যম করা হবে তা পূরণ হবে।

১০. যে উদ্দেশ্যেই সেটা কাছে রাখবে, তা হাসিল হবে।

১১ ব্যাথা ও রোগাক্রান্ত স্থানে রাখার ফলে তা থেকে শেফা (আরোগ্য) লাভ হয়েছে।

১২ যেসব মারাত্মক বিপদাপদে সেটার ওসীলা গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলো থেকে নাজাত ও সাফল্যের রাস্তা খুলে গেছে।

এ প্রসঙ্গে বুযুর্গদের আরো বহু ঘটনা ও ওলামা-ই কেরামের বর্ণনা রয়েছে।[৫৬]

৫৩ হাকিম, মুসনাদুল ফিরদাউস, তারীখ-ই খতীব।

৫৪ মুসনাদ-ই বায্‌যাব।

৫৫ আন্-নূর ও আদ্ব দ্বিয়া ঃ পৃষ্ঠা ১৮ থেকে ২৪। সংক্ষেপিত

৫৬ আল-আনওয়ার ফী আ-দাবিল আ-সার ঃ পৃষ্ঠা ২৮-২৯, মুবারকপুর থেকে মুদ্রিত।

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে তা'যীমী সাজদা করা!

মুসলমান! হে মুসলমান! ওহে হুযূর মোস্তফার শরীয়তের ফরমানের অনুসারী! জেনে রেখো এবং নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, আল্লাহ্ রব্বুল ইয্‌যাত ব্যতীত অন্য কারো জন্য তো ইবাদতের উদ্দেশ্যে সাজদা করা হলে তা নিশ্চিত ও সর্বসম্মতভাবে ঘৃণ্য শির্ক ও সুস্পষ্ট কুফর। আর সাজদা-ই তাহিয়্যাহ্ (সম্মানার্থে সাজদা) নিশ্চিতভাবে হারাম ও গুনাহ্-ই কবীরাহ। অবশ্য, তা'যীমী সাজদাহ্‌কে কুফর বলার ক্ষেত্রে ওলামা-ই দ্বীনের মতবিরোধ রয়েছে। পীর কিংবা পীরের মাযারকে সাজদা করা অবশ্যই অবশ্যই শুধু না-জায়েয ও অবৈধ নয়, বরং হারাম ও অশ্লীল পর্যায়ের কবীরাহ্ গুনাহ।[৫৭]

কবরকে চুমু দেওয়া ও তাওয়াফ করা

নিঃসন্দেহে কা'বা শরীফ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সম্মানার্থে তাওয়াফ করা না-জায়েয। আর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সাজদা করা আমাদের শরীয়তে হারাম। তবে কবরকে চুম্বন করার বিষয়ে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। আর নিষিদ্ধ হবার মধ্যে সর্বাধিক সতর্কতা রয়েছে। বিশেষ করে আউলিয়া-ই কেরামের মাযার শরীফগুলো। আমাদের ওলামা-ই কেরাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কমপক্ষে চার হাত দূরে দাঁড়াবেন। এটাই সাধারণ যিয়ারতকারীদের জন্য আদব। এখন চুম্বন করার কথা কিভাবে কল্পনাও করা যেতে পারে?[৫৮]

এ প্রসঙ্গে কতিপয় প্রশ্ন ও সেগুলোর উত্তর

প্রশ্নাবলী

১. কবর চুম্বনের বিধান কি? ২. কবরের তাওয়াফ করা কেমন? এবং ৩. কবরকে কতটুকু উঁচু করা জায়েয?

সেগুলোর উত্তর

১. কোন কোন আলিম কবরকে চুম্বন করার অনুমতি দিয়ে থাকেন; কিন্তু বেশীরভাগ আলিম মাকরূহ্ মনে করেন। সুতরাং তা থেকে বিরত থাকা চাই।

৫৭ আয্ যুব্‌দাতুয্ যাকিয়্যাহ্ ঃ পৃষ্ঠা ৭ ঃ সামনানী কুতুবখানা, মীরাঠ।

৫৮ আহকাম-ই শরীয়ত ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৩।

'আশি'আতুল্ লুম'আত'- এর মধ্যে রয়েছে-

مسح نکند قبر را بدست بوسہ ندہر آنرا

অর্থাৎ কবরের উপর হাতও বুলাবে না, তাতে চুমও খাবে না।

در بوسہ قبر والدین روایت فقہی ی کنند وصحیح آنسب کہ لا یجوز است

মাদারিজুন্ নুবূয়ত-এ আছে ঃ

অর্থাৎ মাতাপিতার কবরকে চুম্বন করার পরম্পরায় লোকেরা ফিক্বহ্ শাস্ত্রের বর্ণনাদি পেশ করে থাকে; কিন্তু সহীহ হচ্ছে এটাই যে, জায়েয নয়।

২. কবরের তাওয়াফ করার কোন কোন আলিম অনুমতি দিলেও গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে- নিষিদ্ধ। মাওলানা আলী ক্বারী 'মানসাক-ই মুতাওয়াস্সাত্ব'-এ লিখেছেন-

الطواف من مختصات الكعبة فيحرم حول قبور الانبياء والاولياء

অর্থাৎ- তাওয়াফ কা'বারই অন্যতম বৈশিষ্ট। এ কারণে সম্মানিত নবীগণ ও আলিমগণের কবর শরীফগুলোর চতুর্দিকে তাওয়াফ করা হারাম হবে।

কিন্তু এটাকে নির্বিচারে শির্ক সাব্যস্ত করে বসা, যেমন ওহাবী সম্প্রদায়ের ধারনা, নিছক ভিত্তিহীন, ভুল এবং পবিত্র শরীয়তের বিরুদ্ধে অপবাদ রচনার সামিল।

৩. কবরকে এক বিঘত কিংবা সামান্য বেশী উঁচু করবে। এর বেশী ও বিশ্রী ধরণের উচ্চতা মাকরূহ।[৫৯]

মূল কবরের উপর লোবান ও আগরবাতি জ্বালানোর বিধান

উদ, লোবান ইত্যাদি (যেমন আগরবাতি) কোন জিনিষই মূল কবরের উপর জ্বালানো থেকে বিরত থাকা চাই, যদিও তা কোন পাত্রের মধ্যে থাকে। আর কবরের নিকটে জ্বালানো, যেখানে না থাকে কোন তেলাওয়াতকারী, না কোন যিকরকারী, চাই অদূর ভবিষ্যতে আগমনকারীর জন্য হেক, বরং এ ভাবে যে, শুধু কবরের জন্য জ্বালিয়ে দিয়ে চলে আসে, তা হবে প্রকাশ্য নিষিদ্ধ। কারণ, তা হচ্ছে নিছক অপচয় ও সম্পদ বিনষ্ট করা। নেক্কার মৃত ব্যক্তি ওই জানালার কারণে, যা তাঁর কবরে জান্নাত থেকে খুলে দেওয়া হয় এবং বেহেশতবাসী ও বেহেশতী ফুলগুলোর খুশবু আনয়ন করে, তিনি তো দুনিয়ার আগরবাতি ও লোবানের মুখাপেক্ষী নন। আর যদি, আল্লাহরই পানাহ্, যে মৃত ব্যক্তি অন্য কোন অবস্থায় থাকে, (অর্থাৎ আযাবে লিপ্ত থাকে) তবে তো এগুলো তার কোন উপকারে আসবে না।[৬০]

---

৫৯ ফাতাওয়া-ই রেযভিয়াহ্ ঃ ৪র্থ খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১৮০-১৮১, বারকপুর থেকে মুদ্রিত।

৬০ ফাতাওয়া-ই আফরীক্বিয়াহ্ ঃ পৃষ্ঠা ৭০, ফাতাওয়া-ই রেঃ ভিয়াহ্ ঃ ৪র্থ খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১৪১।

মূল কবরের উপর চেরাগ জ্বালানো

কবরের উপর চেরাগ জ্বালানো মানে যদি এর প্রকৃত অর্থই হয়, অর্থাৎ মূল কবরের উপর চেরাগ জ্বালিয়ে রাখা, তবে নিঃশর্তভাবে নিষিদ্ধ। আর আউলিয়া-ই কেরামের মাযারগুলোর উপর তো আরো বেশী না-জায়েয। কারণ, তাতে বে-আদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করা হয়। তদুপরি, মৃতের উপর অনধিকার চর্চা ও অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হয়।

যদি কবর থেকে পৃথক জায়গায় জ্বালানো হয়, আর সেখানে না আছে কোন মসজিদ, না কেউ সেখানে ক্বোরআন মজীদ তেলাওয়াত করার জন্য বসে, না ওই কবর পথের পাশে অবস্থিত, না তা আল্লাহ্র কোন সম্মানিত ওলী বা আলিম-ই দ্বীনের মাযার, মোটকথা তাতে কোন উপকার কিংবা প্রয়োজনও না থাকে, তাহলে এমন চেরাগ জ্বালানো নিষিদ্ধ। কারণ, যখন কোনরূপ উপকার তাতে নেই, তখন তাতো ইসরাফ বা অপচয়ই হলো। আর দ্বিতীয় মূলনীতি অনুসারে (যে কাজ দ্বীনি উপকার ও পার্থিব বৈধ উপকার- উভয়টি শূন্য হয়, তবে অনর্থক কাজই হলো। বস্তুতঃ অনর্থক কাজ খোদই মাকরূহ।

আর তাতে অর্থ ব্যয় করা অপচয়। ...) না-জায়েয সাব্যস্ত হলো। বিশেষ করে, যখন এর সাথে এই মূর্খ সুলভ ধারণাও সংযুক্ত হয় যে, মৃত এ চেরাগ থেকে আলো পারে, অন্যথায় অন্ধকারে থাকবে, তখন তো অপচয়ের সাথে সাথে আক্বীদাও খারাপ হয়ে গেলো। মহান আল্লাহ্রই আশ্রয় প্রার্থনা করছি![৬১]

আর যদি সেখানে মসজিদ থাকে কিংবা ক্বোরআন মজীদের তেলাওয়াতকারী অথবা পরম করুণাময়ের যিক্রকারীদের জন্য আলো জ্বালিয়ে থাকে, অথবা কবর রাস্তার পাশে অবস্থিত, আর নিয়্যতও এ থাকে যে, রাস্তা অতিক্রমকারী তা দেখবে এবং সালাম ও ঈসালে সাওয়াব করে নিজেও উপকৃত হবে, অথবা ওটা কোন ওলী কিংবা আলিমে দ্বীনের হয়, আর আলো জ্বালিয়ে সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে তাঁর প্রতি আদব ও মহত্ব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তা মোটেই নিষিদ্ধ নয়, বরং মুস্তাহাব ও সাওয়াবের কাজ-এ শর্তে যে, তা সীমালঙ্ঘন থেকে পবিত্র হয়।

---

৬১ এ থেকে বুঝা গেলো যে, বিনা প্রয়োজনে আগর বাতি ও লোবান জ্বালানো অপচয়। -নো'মানী

মাযারগুলোর উপর চাদর-গিলাফ চড়ানো

এসব মূলনীতির ভিত্তিতে আউলিয়া-ই কেরামের মাযারগুলোর উপর চাদর-গিলাফ চড়ানোর বৈধতাও প্রমাণিত হয়। সাধারণ লোকের মধ্যে সাধারণ মুসলমানের কবরের কোন মর্যাদাই অবশিষ্ট থাকে নি। আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে, তারা অনায়াসে নাপাক জুতো পরে মুসলমানদের কবরের উপর দৌড়াচ্ছে। আর একথার প্রতি খেয়ালই করছে না যে, এ কোন প্রিয় বান্দার প্রিয় শরীর তার পায়ের নিচে পড়ছে কিনা কিংবা তাদেরকেও কোন দিন এভাবেই মাটিতে শু'তে হবে কিনা! এটাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি যে, মূর্খ লোকেরা কবরের উপর বসে জূয়া খেলছে, অশ্লীল কথাবার্তা বলছে এবং অট্টহাসি হাসছে। কারো কারো মধ্যে এমন দুঃসাহসও দেখেছি যে, না'ঊযু বিল্লাহ্, মুসলমানদের কবরের উপর প্রস্রাব করতেও দ্বিধাবোধ করছে না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জি'ঊন।

সুতরাং দ্বীনের প্রতি যাঁদের দরদ রয়েছে, তাঁরা এদিকে আউলিয়া-ই কেরামের মাযারগুলোকে ওইসব দুঃসাহস থেকে রক্ষা করার জন্য, আর ওদিকে মূর্খ লোকদেরকে তাঁদের সাথে গোস্তাখীর মহা বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য উপকারী ও শরীয়তের প্রয়োজন মনে করেছেন- পবিত্র মাযারগুলো সাধারণ কবর থেকে আলাদা মর্যাদায় থাকুক, যাতে সাধারণের দৃষ্টিতে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় পয়দা হয় এবং দুঃসাহসিক আচরণ করে ধ্বংসে পতিত হওয়া থেকে বিরত থাকে।

এ থেকেও কম প্রয়োজনের তাগিদেও ওলামা-ই কেরাম ক্বোরআন মজীদের কপিকে স্বর্ণ ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করাকে 'মুস্তাহসান' (পুণ্যময় কাজ) মনে করেছেন। দেখুন প্রকাশ্য দ্রষ্টা তো প্রকাশ্য নিয়্যতে অবনত হচ্ছে আর গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে তো কা'বা শরীফের উপর গিলাফ চড়ানোর মধ্যেও এক বড় হিকমত দেখা যায়। তা হচ্ছে-এখানেও না শুধু সম্মান প্রদর্শনের স্বল্পতাই, বরং না'ঊযু বিল্লাহ্! ওইসব জঘন্য অসম্মান প্রদর্শনেরও আশঙ্কা ছিলো। সুতরাং গিলাফ চড়ানো, আলো জ্বালানো, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা এবং সাধারণ লোকদের অন্তরগুলোতে ভক্তি সৃষ্টি করার অতি প্রয়োজন হয়েছে।

মুসলমানদের কবরের প্রতি সম্মান দেখানো

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, "তরবারির ধারাল পাশের উপর পা রাখা আমার নিকট মুসলমানের কবরের উপর পা রাখার চেয়ে সহজ।" অন্য হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, "যদি আমি আগুনের জ্বলন্ত কয়লার উপর পা রাখি, আর শেষ পর্যন্ত তা জুতোর তলদেশ ভেদ করে আমার পায়ের তালু পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবুও এটা আমার নিকট মুসলমানের কবরের উপর পা রাখা থেকে বেশী পছন্দনীয়।" লক্ষ্য করুন! এ কথাটা তিনিই বলছেন, যিনি, আল্লাহ্রই শপথ, যদি তিনি কোন মুসলমানের শির, বক্ষ ও চোখের উপর কদম-ই আক্বদাস রেখে দেন, তবে তাকে তো উভয় জাহানের শান্তিই দান করলেন। সাল্লাল্লাহু

তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

'ফতহুল ক্বদীর', 'ত্বাহত্বাভী' এবং 'দুর্রুল মোখতার'-এ উল্লেখ করা হয়েছে- المرور في سكة حادثة في المقابر حرام অর্থাৎ কবরস্তানে যেই নতুন রাস্তা বের করা হয়, তা দিয়ে চলাচল করা হারাম। কারণ, তা অবশ্যই কবরগুলোর উপর হবে। তবে পুরানা রাস্তা দিয়ে চলাচল করা এমনি নয়। কারণ, কবরগুলো ছেড়েই তো সেটা তৈরী করা হয়েছিল। হুযূরই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে একজন লোক কবরস্তানের দিকে জুতো পরে বের হলো। তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন ঃ ياصاحب السبتيتين الق سبتيتيك لاتؤذ صاحب القبر ولايؤذيك অর্থাৎ- হে সংস্কারকৃত চামড়ার জুতো পরিধানকারী! তোমার জুতো দু'টি খুলে ফেলো! যাতে তুমি না কবরবাসীকে কষ্ট দাও, না সে তোমাকে কষ্ট দেয়।[৬২]

কবরের উপর নামায পড়া হারাম, কবরের দিকে নামায পড়া হারাম, কবরের উপর কদম রাখা হারাম, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা কিংবা চাষাবাদ ও ক্ষেত ইত্যাদি করাও হারাম। ...[৬৩]

মুহার্রম ও তা'যিয়া মিছিল

আরয ঃ খেলা-তামাশা মনে করে তা'যিয়া মিছিলে যাওয়া কেমন?

এরশাদ ঃ যাওয়া উচিত হবে না। না জায়েয কাজে জান-মাল দিয়ে সাহায্য করা যেমন, তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে সাহায্য করাও তেমনি হবে। না-জায়েয কাজের তামাশা দেখাও না-জায়েয। বানর নাচানো হারাম। সেটার তামাশা দেখাও হারাম। 'দুররে মুখতার' ও 'হাশিয়া-ই ত্বাহত্বাভী'র মধ্যে এ মাসআলাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আজকাল লোকেরা সেগুলোর প্রতি উদাসীন।

মুত্তাক্বী লোকেরাও, যারা শরীয়তের প্রতি যত্নবান, অজানাবশতঃ দৌড় প্রতিযোগীতা ও বানরের তামাশা কিংবা মোরগের লড়াই দেখে আর জানে না যে, তাতে তারা গুনাহ্গার হয়।

৬২ আল-মালফূয ঃ ৩য় খণ্ড ঃ ১৮পৃষ্ঠা।

৬৩ ইরফান-ই শরীয়ত ঃ ৩য় খণ্ড ঃ ১৮ পৃষ্ঠা।

হাদীসে পাকে এরশাদ হয়েছে যে, যদি কোন ভালো কাজের জমায়েত হয়, কিন্তু কেউ তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে নি। পরবর্তীতে খবর পেয়ে তজ্জন্য আফসোস্ করলো, তবে সে ততটুকু সাওয়াব পাবে, যতটুকু পেয়েছে অংশগ্রহণকারীরা। আর যদি কোন জমায়েত মন্দ কাজের হয়, আর কেউ তাতে অংশগহণ করতে না পারার জন্য আফসোস্ করলো, তবে যে গুনাহ্ তাতে অংশগ্রহণকারীরা পেয়েছে, ততটুকু গুনাহর ভাগী সেও হয়েছে।

আরয ঃ মুহার্‌রমের মজলিসগুলোতে যেই শোক ও মাতমখানি ইত্যাদি করা হয়, সেগুলো শোনা উচিত কিনা?

এরশাদ ঃ মাওলানা শাহ আবদুল আযীয সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র কিতাব, যা আরবী ভাষায় রচিত, কিংবা আমার ভাই হাসান মিয়া মরহুমের রচিত কিতাব 'আয়না-ই ক্বিয়ামত'-এর মধ্যে এ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ বর্ণনাদি রয়েছে। ওইগুলো শোনা চাই। বাকী ভুল বর্ণনাদি পড়ার চেয়ে না পড়া এবং না শোনা উত্তম।

আরয ঃ ওই সব মজলিসে মন গলে যাওয়া কেমন?

এরশাদ ঃ মন গলে যাওয়ার মধ্যে ক্ষতি নেই। বাকী রইলো রাফেযীদের (শিয়াগণ) মতো অবস্থার সৃষ্টি করা জায়েয নয়। কারণ, তখন তা **من تشبه بقوم فهومنهم** (অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য অবলম্বন করে রাখে সে তাদের অন্তর্ভূক্ত) অনুসারে মন্দ। তা'ছাড়া, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নি'মাতগুলোর ঘোষণা বা চর্চা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর মুসীবতের সময় ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বেলাদত শরীফ হয়েছে ১২ রবিউল আউয়াল শরীফে সোমবার এবং ওফাত শরীফও ওই দিনে (সোমবার) হয়েছে। তবুও ইমামগণ ওই দিন খুশীই প্রকাশ করেছেন; শোক পালনের হুকুম শরীয়ত দেয় না।[৬৪]

মুহার্‌রামুল হারামে শোক ও মাতমখানির মজলিসে হাযির হওয়া জায়েয কিনা? এর জবাবে এরশাদ করেছেন-

"জায়েয নয়। কারণ সেগুলো নিষিদ্ধ ও শরীয়ত-বিরোধী কথাবার্তায় ভরপুর থাকে।" আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন।[৬৫]

৬৪ ইরফান-ই শরীয়ত ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৯১-৯২

৬৫ ইরফান-ই শরীয়ত ঃ পৃষ্ঠা১৬।

মুহার্‌রমের কাপড়

মুহার্‌রমের দিনগুলোতে, অর্থাৎ ১ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত তিন ধরনের রংয়ের কাপড় না পরা চাইঃ

১. কালো। কারণ, এটা রাফেযী (শিয়া) সম্প্রদায়ের কুপ্রথা।
২. সবুজ। কারণ, এটা বিদ্'আতী সম্প্রদায়, অর্থাৎ শোক-মিছিলকারীদের কুপ্রথা।
৩. লাল। কারণ, এটা খারেজীদের কুরীতি। তারা, আল্লাহ্‌রই পানাহ্, খুশী প্রকাশ করার জন্য লাল রংয়ের পোশাক পরে থাকে।[৬৬]

ওরস ও ক্বাওয়ালী

প্রশ্নের সারসংক্ষেপ ঃ ওরসে ঢোল ও সারঙ্গীর সাথে ক্বাওয়ালীর বিধান কি এবং তাতে যারা হাযির হয়, তারা গুনাহ্গার কিনা?

জবাব ঃ এমন ক্বাওয়ালী হারাম এবং তাতে যারা হাযির হয় তারা সবাই গুনাহ্গার। তাদের সবার গুনাহ্ এধরনের ওরসের আয়োজক ও ক্বাওয়ালদের উপর বর্তায়। আর ক্বাওয়ালদের গুনাহও ওই ওরস আয়োজনকারীদের উপর বর্তায়- এমনিভাবে যে, ক্বাওয়ালদের গুনাহ্ ওরস আয়োজনকারীদের দায়িত্বে বর্তনোর পর ক্বাওয়ালদের গুনাহ্ সামান্যটুকুও হ্রাস পাবে না।

অনুরূপ, ওরস আয়োজনকারী ও ক্বাওয়ালদের উপর, যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের গুনাহ্ বর্তালেও হাযেরীনের গুনাহ্ বিন্দুমাত্রও হ্রাস পাবে না; বরং হাযেরীনের মধ্যে প্রত্যেকের উপর তার পূর্ণ গুনাহ্ ও ক্বাওয়ালদের উপর তাদের নিজেদের গুনাহ্ পৃথকভাবে এবং উপস্থিত সবার সমান গুনাহ্ পৃথকভাবে বর্তাবে। এমন ওরস আয়োজনকারীদের নিজ নিজ গুনাহ্ আলাদাভাবে, আর ক্বাওয়ালদের সমান গুনাহ্ আলাদাভাবে আবার সব অংশগ্রহণকারীর সমান গুনাহ্ আলাদাভাবে। এর কারণ হচ্ছে-অংশগ্রহণকারীদেরকে ওরসের আয়োজকই ডেকে এনেছে। অথবা তারই কারণে গুনাহ্র এসব সামগ্রীর বিস্তার ঘটেছে আর ক্বাওয়ালগণও তাদেরকে ক্বাওয়ালী শুনিয়েছে। যদি সে এর আয়োজন না করতো আর ক্বাওয়ালরাও এ ঢোল ও সারঙ্গী ইত্যাদি না শোনাতো, তবে শ্রোতারা এ গুনাহ্য় কিভাবে লিপ্ত হতো? সুতরাং এ সবের গুনাহ্ ওই দু'জনের উপর বর্তালো। তারপর ক্বাওয়ালদের এ গুনাহ্র মাধ্যম হলো ওই ওরসের আয়োজনকারী। সে যদি আয়োজন না করতো, না ডাকতো, তবে এরা কিভাবে আসতে পারতো ও বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতো? সুতরাং ক্বাওয়ালদের গুনাহ্ও ওই আহ্বানকারীর উপর বর্তালো।

৬৬ আ'লা হযরত ক্বেবলা কুদ্দিসা এবং 'বাহারে শরীয়ত' ঃ ১৬শ খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৫৩. লাহোরে শেখ গোলাম আলী এণ্ড সন্স কর্তৃক মুদ্রিত।

যেমনটি ফক্বীহগণ বলেছেন এক মজবুত পশ্নের জবাবে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

من دعاالى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لاينقص ذلك من اجور هم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لاينقص من ذلك من اثامهم شيئا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন হিদায়তের কাজের দিকে আহ্বান করে, যতলোক তার অনুসরণ করবে, সে তাদের সমান সাওয়াব পাবে। আর এর কারণে তাদের সাওয়াবগুলো কোনরূপ হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কোন গোমরাহীর কাজের দিকে আহ্বান করে, যতলোক তার আহ্বানে সাড়া দেয়, তাদের সমপরিমাণ গুনাহ্ তার উপর বর্তায়। আর এ কারণে তাদের গুনাহ্ কোনরূপ হ্রাস পাবে না।[৬৭]

বাদ্যযন্ত্র হারাম হবার প্রসঙ্গে বহু হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ের বিশুদ্ধ হাদীস হচ্ছে বোখারী শরীফের হাদীস-

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন ঃ

ليكونن في أمتي اقوام يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف حديث جليل متصل وقد اخرجه ايضا احمد وابو داؤد وابن ماجه والاسماعيلي وابو نعيم باسانيد صحيحة لا مطعن فيها صححه جماعة آخرون من الائمة كما قاله بعض الحفاظ قاله الامام ابن حجر في كف ارعاع.

অর্থাৎ অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছুলোক পয়দা হবে, যারা হালাল স্থির করে নেবে-নারীদের গোপনাঙ্গকে, অর্থাৎ যিনাকে, রেশমী কাপড়, মদ এবং বাদ্যযন্ত্রকে। এ মহান হাদীস 'মুত্তাসিল' পর্যায়ের। (হুযূর পর্যন্ত সনদ পৌঁছে যায় এমন) আর এই হাদীস সহীহ্ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন-ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, ইমাঈলী ও আবূ নু'আঈম, যাতে সমালোচনার কোন অবকাশ নেই। ইমামগণের অন্য জমা'আতও সেটাকে সহীহ্ বলেছেন।[৬৮]

৬৭ এটা বর্ণনা করেছেন হাদীসের ইমামগণ, যেমন- আহমদ ও মুসলিম, আরো চারজন হযরত আবূ হোরায়রাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে।

৬৮ যেমন-হাফেয ইমাম ইবনে হাজর আপন কিতাব 'কাফফুর রু'আ'য় বর্ণনা করেছেন। -নো.মানী

কোন কোন মূর্খ, মন্দ ধরনের মাতাল, আধা-মোল্লা, প্রবৃত্তি-পূজারী কিংবা ভণ্ড সূফী এ ব্যাপারে তৎপর যে, তারা সহীহ্, মরফূ' ও মুহকাম হাদীস শরীফসমূহের মোকাবেলায় কোন কোন দুর্বল কিস্সা কিংবা সন্দেহপূর্ণ ঘটনা, অথবা অস্পষ্ট অর্থবোধক বিষয়াদি পেশ করে থাকে। তাদের এতটুকু বিবেক নেই কিংবা স্বেচ্ছায় বিবেকহীন সেজে বসে। বস্তুতঃ সহীহ্র সামনে দুর্বল, 'মুতা'আইয়্যান'-এর সামনে 'মহতামাল', 'মুহকাম'-এর সামনে 'মুতাশাবিহ্'কে পরিহার করা ওয়াজিব। তারপর কোথায় কথা, কোথায় কাজ। অতঃপর কোথায় হারামকারী, কোথায় মুবাহকারী? যে কোনভাবে এটা আমল করা ওয়াজিব। প্রাধান্য এটারই। কিন্তু উচ্চাভিলাষ পূজার চিকিৎসা কার নিকট আছে? আহা! যদি গুনাহ্কে গুনাহ্ বলে জানতো! স্বীকার করতো! এ হঠকারিতা আরো জঘন্য যে, উচ্চাভিলাষকেও লালন করবে, অপবাদও প্রতিহত করবে! নিজের জন্য হারামকে হালাল বানাবে। শুধু তাই নয়, বরং আল্লাহরই পানাহ্! এর অপবাদ আল্লাহ্র মাহবুব বান্দাগণ ও চিশ্তিয়া সিল্সিলার শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গগণ (কুদ্দিসাত আস্রারুহুম)-এর উপর আরোপ করে; না আল্লাহকে ভয় করে, না বান্দাদের সামনে লজ্জাবোধ করে।

অথচ খোদ্ হুযূর মাহবূবে ইলাহী সাইয়্যেদী ওয়া মাওলাঈ নেযামুল হক্ব ওয়াদ্ দ্বীন সুলতানুল আউলিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু ওয়া 'আনহুম 'ফাওয়াইদুল ফাইয়াইদ' শরীফে বলেছেন, "মাযামীর হারাম আস্ত।" (অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্র হারাম)।

মাওলানা ফখরুদ্দীন যারাভী খলীফা-ই হুযূর সাইয়্যেদুনা মাহবূবে ইলাহী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা হুযূর (মাহবূব-ই ইলাহী)'র যমানা মুবারকে খোদ্ হুযূরের নির্দেশে সামা'র মাসআলায় একটি পুস্তিকা 'কাশ্ফুল ক্বানা' 'আন উসূলিস্ সামা' লিখেছেন। তাতে পরিস্কারভাবে লিখেছেন ঃ

اما اسماع مشائخنا رضي الله تعالى عنهم فبرىء عن هذه التهمة وهو مجرد صوت القوال مع الاشعار المشعرة من كمال صنعة الله تعالى.

অর্থাৎ আমাদের মাশাইখ-ই কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম-এর সামা' ওই বাদ্যযন্ত্রের অপবাদ থেকে পবিত্র। তাতো নিছক ক্বাওয়ালের আওয়াজ মাত্র ওইসব শ্লোক সহকারে, সেগুলো আল্লাহ্র শিল্পকর্ম সম্পর্কে খবর দেয়।

আল্লাহ্র ওয়াস্তে ইনসাফ করুন! খান্দানে চিশ্তিয়া আলিয়ার ওই মহান ইমামের এ এরশাদ গ্রহণযোগ্য হবে, না আজকালকার ওইসব লোকের ভিত্তিহীন অপবাদ ও প্রকাশ্য ফ্যাসাদ? লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আলিয়্যিল 'আযীম।

বিয়ের জন্য ভিক্ষা করা

আজকাল অনেক লোক কন্যার বিয়ের জন্য ভিক্ষা চায়। আর তাতে উদ্দেশ্য থাকে ভারত তথা উপমহাদেশের প্রচলিত রসমগুলো পূর্ণ করা। অথচ ওই রসমগুলো মোটেই শরীয়তের প্রয়োজনে পড়ে না। সুতরাং তাদের জন্য ভিক্ষা করা হালাল হতে পারে না। অবশ্য, মুসলমানদের জন্য উচিত হচ্ছে- কনের অভাবী অভিভাবকদেরকে সাহায্য করা। হাদীস শরীফে তাকে সাহায্য করা ও তাকে কর্জ দেওয়ার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে।

কেউ কেউ তো ভিক্ষা চায় এ বলে যে, হজ্জে যাবে। এটাও হারাম এবং তাকে দেওয়াও হারাম। কারণ, **ما حرم أخذه حرم اعطائه** অর্থাৎ- "যা লওয়া হারাম, তা দেওয়াও হারাম।" অভাবী লোকের জন্য হজ্জ্ হচ্ছে নফল। আর ভিক্ষা করা হচ্ছে- হারাম। নফলের জন্য হারামকে অবলম্বণ করা কে মেনে নেবে?[৬৯]

মসজিদে ভিক্ষা করা

মসজিদে ভিক্ষা করবে না। কারণ, হাদীস শরীফে এর নিষেধ এসেছে। আর তাদের ভিক্ষা দেওয়াও উচিত হবে না। কারণ, তা একটা মন্দ কাজের উপর সাহায্য করার সামিল। উলামা-ই কেরাম বলেন, মসজিদের ভিক্ষুককে একটি মাত্র পয়সা দিলে আরো সত্তর পয়সা দিতে হবে, যা এর কাফ্ফারা হয়। 'হিন্দিয়্যাহ্' ও 'আল-হাদীক্বাতুন্ নাদিয়্যাহ্'র মধ্যে এমনি উল্লেখ করা হয়েছে।

আর যদি কেউ এমনি অশালীনভাবে ভিক্ষা করে যে, সে নামাযীদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে কিংবা উপবিষ্টদের মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে যায়, তবে তাকে ভিক্ষা দেওয়া সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ। 'দুররে মুখতার'-এ যে নিষেধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য। 'আস্সালাত'-এর মধ্যে নিঃশর্তভাবে নিষেধকে জোর দিয়ে বলেছেন। আর তা 'কথিত আছে' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৭০]

৬৯ আহসানুল ভি'আ ঃ পৃষ্ঠা ১৩০।
৭০ আহসানুল ভি'আ' ঃ ১৩২।

সুস্থ ব্যক্তির ভিক্ষা করার প্রসঙ্গে

যে মজবুত, সুস্থ ও উপার্জনক্ষম লোক ভিক্ষা করে বেড়ায়, তাদেরকে ভিক্ষা দেওয়া গুনাহ। আর তাদের জন্য ভিক্ষা করাও হারাম এবং তাদেরকে ভিক্ষা দিলে হারামের জন্য সাহায্য করার সামিল। যদি কেউ তাকে ভিক্ষা না দেয়, তবে সে ভিক্ষাবৃত্তি বাদ দিয়ে অন্য পেশা অবলম্বণ করবে। 'দুর্‌রে মুখতার'-এর মধ্যে আছে-

لايحل أن يسئل من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه ان علم بحاله لاعانتة على المحرم.

অর্থাৎ যে ব্যক্তির নিকট ওই দিনের খোরাক আছে-চাই তা বাস্তবে থাকুক কিংবা উপার্জন করার শক্তি থাকুক, তার পক্ষে খোরাকের জন্য ভিক্ষা করা হালাল নয়। যেমন উপার্জনক্ষম সুস্থ ব্যক্তি। এমন লোককে, তার অবস্থা জানা সত্ত্বেও যে দান করে, সে গুনাহ্গার। কারণ, সে হারামের উপর সাহায্য করলো।" এই ব্যাপক মূলনীতি স্মরণ রাখার যোগ্য। এটা অনেক স্থানে কাজে আসবে।[৭১]

সন্তানদের উপর ওফাতের পর মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য

প্রশ্ন করা হলো-মাতাপিতা মৃত্যুবরণ করার পর সন্তানদের উপর মাতাপিতার প্রতি কি কি কর্তব্য বর্তায়? জবাবে আ'লা হযরত বললেন ঃ

১. তাঁদের ওফাতের পর সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের জানাযা নামাযের জন্য ব্যবস্থা করা- গোসল করানো, কাফন পরানো এবং নামায ও দাফন। আর এসব কাজে সুন্নাতসমূহ ও মুস্তাহাব কার্যাদির প্রতি যত্নবান হওয়া, যাতে তাঁদের জন্য প্রতিটি সৌন্দর্য, বরকত, রহমত ও প্রাচূর্য-প্রশস্ততার আশা করা যায়।
২. তাঁদের জন্য দো'আ ও ইস্তিগফার সর্বদা করতে থাকা। এতে কখনো আলস্য না করা।
৩. সাদক্বাহ্-খায়রাত ও সৎকার্যাদির সাওয়াব তাঁদের নিকট পৌছাতে থাকা। যথাসম্ভব তাতে ত্রুটি না করা। নিজেদের নামাযের সাথে তাদের জন্যও নামায পড়া। নিজেদের রোযার সাথে তাঁদের জন্যও রোযা রাখা; বরং যেসব নেক্ কাজ করবে সবটির সাওয়াব তাঁদেরকে ও সমস্ত মুসলমানকে দান করে দেওয়া। কারণ, তাদের সবার নিকট সাওয়াব পৌছে যাবে, অথচ তার সাওয়াব হ্রাস পাবে না, বরং বাড়তে থাকবে।

৭১ আল-কাশফু শাফিয়া ঃ পৃষ্ঠা ৯২।

৪. তাঁদের দায়িত্বে কারো কর্জ থেকে গেলে তা পরিশোধ করার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের ত্বরা ও চেষ্টা করা। আর নিজের সম্পদ থেকে তাঁদের কর্জ পরিশোধ করাকে উভয় জাহানের সৌভাগ্য মনে করা। নিজের নিকট ক্ষমতা না থাকলে নিজের প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য দানশীলের নিকট থেকে তা পরিশোধ করার জন্য সাহায্য নেওয়া।

৫. কর্জের কথাতো উল্লেখ করা হয়েছে। হজ্জ্ না করে থাকলে নিজে তাঁদের পক্ষ থেকে হজ্জ্ করা কিংবা হজ্জে বদল করানো, যাকাত কিংবা ওশর তাঁদের দায়িত্বে অনাদায়ী থেকে গেলে, তা পরিশোধ করে দেওয়া। নামায কিংবা রোযা অসম্পন্ন থেকে গেলে সেগুলোর কাফ্ফারা দেওয়া। এভাবে যে কোন প্রকার দায়িত্ব থেকে তাঁদেরকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালানো।

৬. তাঁরা যেই শরীয়তসম্মত ও বৈধ ওসীয়ত করে গেছেন, তা পূরণ করার সাধ্য মতো চেষ্টা করা, যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে তা নিজের উপর অপরিহার্য নয়, যদিও তা হয় নিজের জন্য কষ্টসাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ, সে সম্পত্তির অর্ধেক তাঁদের ওয়ারিস নয় এমন কোন প্রিয়জনের অনুকূলে কিংবা কোন নিছক অনাত্মীয়ের অনুকূলে অসীয়ৎ করে গেলেন। এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান হচ্ছে-তাঁদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশীতে, তাঁদের ওয়ারিশানের বিনা অনুমতিতে প্রযোজ্য হবে না। তবে সন্তানদের উচিত হচ্ছে তাঁদের ওসীয়ত মেনে নেওয়া এবং তাঁদের মনের ইচ্ছা পূরণকে নিজেদের প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার উপর প্রাধান্য পাবার উপযোগী মনে করা।

৭. তাঁদের শপথ মৃত্যুর পরও সত্য করেই দেখাও। মাতা-পিতা এ মর্মে শপথ করেছিলেন- 'আমার পুত্র অমুক জায়গায় যাবে না, অথবা অমুকের সাথে সাক্ষাৎ করবে না, অথবা কাজটি করবে', তখন তাঁদের পর একথা খেয়াল করবে না যে, তাঁরা তো এখন নেই। তাঁদের শপথের প্রতি শুধু খেয়ালই রাখবে না, বরং সেটা তেমনিভাবে পালন করবে, যেমন তাঁদের জীবদ্দশায় পালন করছিলে- যতক্ষণ পর্যন্ত কোন শরীয়তসম্মত অসুবিধা অন্তরায় না হয়।

শুধু শপথের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রত্যেক ধরনের বৈধ বিষয়ে তাঁদের মৃত্যুর পরও তাঁদের মর্জি অনুসারে নিয়মিত কাজ করবে।

৮. প্রত্যেক জুমু'আয় তাঁদের কবর যিয়ারত করতে যাবে। সেখানে এতো উচ্চস্বরে 'সূরা ইয়াসীন' শরীফ পড়বে, যাতে তাঁরা শুনতে পান। আর সেটার সাওয়াব তাঁদের রূহে পৌঁছাবে। পথিমধ্যে যখনি তাঁদের কবর আসবে, সালাম-ফাতেহা না পড়ে তা অতিক্রম করবে না।

৯. তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে গোটা জীবন সদ্ব্যবহার করতে থাকবে।

১০. তাঁদের বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখবে। সব সময় তাঁদের প্রতি সম্মান দেখাবে।

১১. কখনো কারো মাতাপিতাকে মন্দ বলে তাদেরকে মন্দ সাব্যস্ত করবে না।

১২. সর্বাপেক্ষা কঠিন, ব্যাপক ও স্থায়ী কর্তব্য হচ্ছে-কখনো কোন গুনাহ্ করে তাঁদের কবরে কষ্ট পৌছাবে না। তার সব কর্মের খবর মাতাপিতার নিকট পৌছে। নেকীগুলো দেখে তাঁরা খুশী হন, আর তাঁদের চেহারা খুশীতে চমকাতে থাকে। পক্ষান্তরে, গুনাহ্ দেখে দুঃখিত হন এবং তাঁদের কবরে কষ্ট পৌছুবে।

আল্লাহ্ মহা ক্ষমাশীল, দয়ালু, দয়াময় ও দয়ার্দ্র। তিনি মহামহিম। তিনি আপন দয়ালু দয়ার্দ্র হাবীব আলায়হি ওয়া আলা আলিহী আফদ্বালুস্ সালাতি ওয়াত্ তাসলীম-এর ওসীলায় আমরা সব মুসলমানকে সৎ কার্যাদি করার সামর্থ্য দান করুন, পাপাচারাদি থেকে রক্ষা করুন, আমাদের বড়দের কবরে সর্বদা আলো ও শান্তি পৌছাতে থাকুন! তিনি তা করতে সক্ষম। আমরা অক্ষম। তিনি অমুখাপেক্ষী। আমরা মুখাপেক্ষী। আমাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থাপক আল্লাহ্‌ই যথেষ্ঠ।[৭২]

সন্তানদের প্রতি মাতাপিতার কর্তব্য

১. স্নেহের বশীভূত হয়ে নিম্নমানের উপাধি ও তুচ্ছ নাম রাখবেন না। যে নাম একবার প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, তা পরিবর্তন করা খুবই মুশকিল ব্যাপার।

২. ছেলেমেয়েদেরকে পবিত্র উপার্জন থেকে পবিত্র জীবিকা দেবেন। কারণ, না পাক সম্পদ নাপাক অভ্যাসই আনে।

৩. মন ভোলানোর জন্য মিথ্যা ওয়াদা করবেন না; বরং শিশুদের সাথে ওই ওয়াদা করা জায়েয, যা পূরণ করার ইচ্ছা রাখেন।

৪. বুলি আরম্ভ হতেই 'আল্লাহ্, আল্লাহ্, তারপর 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্' তারপর পূর্ণ কলেমা শেখাবেন।

৫. (পুত্র সন্তানকে) নেক্কার, সৎ, খোদাভীরু, বিশুদ্ধ (সুন্নী) আক্বীদাসম্পন্ন ও বৃদ্ধ ওস্তাদের নিকট সোপর্দ করবেন আর কন্যা সন্তানকে সতী ও বিবাহিতা মহিলার নিকট পড়াবেন।

৬. ক্বোরআন খতম করার পরও সব সময় তেলাওয়াত করার তাকীদ দেবেন।

৭. ইসলামী আক্বীদাগুলো ও সুন্নাত শিক্ষা দেবেন।

৮. হুযূর-ই আক্বদাস রহমত-ই আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর ভালবাসা ও মহত্ব তাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলবেন। এটা হচ্ছে ঈমানের মূল ও সত্তা।

৯. সাত বছর বয়সে নামাযের জন্য তাকীদ দিতে আরম্ভ করবেন। যখন দশ বছর বয়স হবে তখন নামায না পড়লে তজ্জন্য প্রহার করবেন এবং নামায পড়তে বাধ্য করবেন।

১০. ইল্‌মে দ্বীন, বিশেষ করে ওযূ, গোসল, নামায, রোযা ইত্যাদির মাসআলাদি পড়াবেন।

৭২ শরহুল হুক্বূক্ব লিত্বারহিল 'উক্বূক্ব : পৃষ্ঠা ১১-১৩ : কলীমী লাইব্রেরী, কানপুর, 'আহকাম-ই শরীয়ত : ১ম খণ্ড : পৃষ্ঠা ১৪-২০ : সামনানী প্রেস, মীরাঠ।

১১. পড়ানো ও শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে স্নেহ ও নম্রতার প্রতি খেয়াল রাখবেন।
১২. প্রয়োজনে চোখ রাঙ্গাবেন, ধমকাবেন, ভয় দেখাবেন। অভিশাপ দেবেন না। অভিশাপ দেওয়া তাদের জন্য সংশোধনের কারণ হবে না; বরং আরো বেশী ফ্যাসাদের সম্ভাবনা দেখা দেবে।
১৩. শিক্ষার্থী থাকাকালে একটা সময় খেলাধুলার জন্যও দেবেন। কখনো মন্দ লোকের সংস্রবে বসতে দেবেন না।
১৪. পুত্র-সন্তানকে লেখাপড়া ও সৈনিক-ট্রেনিং দেবেন।
১৫. কন্যা সন্তানকে কাপড়-সেলাই, সুতা কাটা, রান্নার কাজ শিক্ষা দেবেন। আর 'সূরা-ই নূর' শিক্ষা দেবেন।
১৬. বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে, যেখানে নাচ-গান হয়, কখনো যেতে দেবেন না, যদিও হয় নিজের খাস ভাইয়ের আয়োজন। কারণ, গান হচ্ছে জঘন্য ও ভয়ানক যাদু।[৭৩]

স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য ঃ

১৭. স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে-তার খোরপোশ দেওয়া, থাকার ঘর দেওয়া, মহর সময়মতো পরিশোধ করে দেওয়া, তার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাকে শরীয়ত-বিরোধী কার্যাদি থেকে দূরে রাখা। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান ঃ

وعاشروهن بالمعروف অর্থাৎ- তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। আরো এরশাদ ফরমান ঃ

يايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا (الجزء ٢٨ : الركوع ١٩)

অর্থাৎ- হে ঈমানদারগণ! নিজের প্রাণকে ও নিজের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো।[৭৪]

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ঃ

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য- বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদির মধ্যে, আল্লাহ্ ও রসূলের পর, সমস্ত কর্তব্য, এমনকি মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য অপেক্ষাও বেশী। এসব বিষয়ে তার আদেশাবলী পালন করা, তার মান-মর্যাদার প্রতি যত্নবান হওয়া স্ত্রীর উপর বৃহত্তর গুরুত্বপূর্ণ ফরয। তার অনুমতি ব্যতিরেকে মুহরিমদের নিকট ব্যতীত অন্য কোথাও যেতে পারবে না। তাও এভাবে যে, মাতাপিতার নিকট প্রতি আট দিনের মাথায়।

৭৩ মাশ'আলাতুল ইরশাদ, সংক্ষেপিত।
৭৪ পারা-২৮ ঃ রুকূ'১৯।

তাও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্তের জন্য, বোন, ভাই, চাচা, মামা, খালা ও ফুফীর নিকট গোটা এক বছর পর। আর রাতে তো কোথাও যেতে পারবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যদি আমি কাউকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সাজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে স্ত্রীকে হুকুম দিতাম যেনো সে আপন স্বামীকে সাজদা করে।"

অন্য এক হাদীসে আছে, "যদি স্বামীর নাকের ছিদ্র থেকে রক্ত ও পূঁজ প্রবাহিত হয়ে তা পায়ের মুড়ি পর্যন্ত গিয়ে জমে ভর্তি হয়ে যায়, আর স্ত্রী আপন জিহ্বা দিয়ে লেহন করে তা পরিস্কার করে, তবুও তার হক্ব আদায় হবে না।" (অর্থাৎ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য আদায় হবে না।) আল্লাহই সর্বাপেক্ষা বেশী অবগত।[৭৫]

দো'আ ও এর গ্রহণযোগ্যতা

দুনিয়ার কুকুরদের নিকট থেকে কিছু পাবার আশাবাদী ও প্রার্থীদের দেখা যায় যে, তিন তিনটি বছর পর্যন্ত প্রার্থী হিসেবে অতিবাহিত করে দেয়। সকাল-সন্ধ্যা তাদের দ্বারে দ্বারে দৌড়াতে থাকে; অথচ তারা এদের দিকে ফিরেও চায় না, দেয় না সাক্ষাতের সুযোগ। ধমক দিয়ে তাড়ায়, বিরক্তিবোধ করে, নাক ছিটকায় ভ্রু সংকুচিত করে এবং তার নিজস্ব কাজের বালাও তার উপর চাপিয়ে দেয়।

এ সব লোক পকেট থেকে খায়, ঘর থেকে আনে। বেকার কাজের বালা সহ্য করে। সেখানে বছরের পর বছর অতিবাহিত করে দেয়। তবুও যেনো প্রথম দিনেই এসেছে। তবুও তারা না নিরাশ হয়, না পিছু ত্যাগ করে। কিন্তু আহ্কামুল হাকিমীন, আকরামুল আকরামীন (শাসকদের শাসক, সর্বপেক্ষা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ্) আয্যা ওয়া জাল্লা'র দরজায় প্রথমতঃ আসেই বা কয়জন? আসলেও বিরক্ত হয়, ভেঙ্গে পড়ে, কাল কেন হবে, আজ কেন হচ্ছে না? এক সপ্তাহ্ ধরে কিছু তো পড়ে আসছি জনাব, কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না! এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করে। বস্তুতঃ এ আহম্মক নিজেই নিজের দো'আ ক্ববূল হবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

يستجاب لاحدكم مالم يعجل بقول دعوت فلم يستجب.

অর্থাৎ "তোমাদের কারো দো'আ ক্ববূল হয় যতক্ষণ না এ কথা বলতে ত্বরা করে "আমি দো'আ করেছিলাম, ক্ববূল হলো না।"

৭৫আহকাম-ই শরীয়ত ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৭৭।

আবার কেউ তো এজন্য এমনি লাগামহীন হয়ে যায় যে, সৎকর্ম ও দো'আ ইত্যাদির প্রভাবের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে যায়; বরং আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লার ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির প্রতিও বিশ্বাস খুইয়ে বসে। দয়ালু দাতা আল্লাহ্রই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এমন লোকদেরকে বলতে হয়- "ওহে বেহায়া, নির্লজ্জ লোকেরা! নিজের বগলে একটু মুখ দিয়ে দেখো! যদি তোমাদের কোন সমকক্ষ বন্ধুও তোমাকে কোন কাজ করে দিতে হাজার বার বলে, আর তুমি তার কাজটি একবারও করলে না, তখন কোন কাজ তাকে করতে বলার ক্ষেত্রে প্রথমে তো এ ভেবে তুমি লজ্জাবোধ করবে যে, 'আমি তো তার কথা রক্ষাই করি নি, এখন কোন্ মুখে তাকে আমার কাজ করে দিতে বলবো।' আর যদি স্বার্থোদ্ধারের নেশায় মত্ত হয়ে বলেও ফেলা হয়, আর সেও তা না করে থাকে, তবে তা মোটেই অভিযোগ করার উপযোগী মনে করবে না; বরং একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে- 'আমিইবা কবে তার কাজ করে দিয়েছি, সে কেন আমার কাজ করতে যাবে?' এখন নিজের বিবেককে প্রশ্ন করো- তুমি প্রকৃত মালিকের নির্দেশাবলী পালন করেছো কিনা? যদি তাঁর নির্দেশ পালন না করে থাকো, আর এটা চাও যে, ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় নিজের দরখাস্ত ক্ববূল হোক, তবে তা কেমন নির্লজ্জতা হবে?

ওহে আহম্মক! তারপর যাচাই করে দেখ! নিজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত গভীরভাবে দৃষ্টিপাত কর! প্রতিটি মূহূর্তে কতো কতো হাজার, বরং অগণিত নি'মাত রয়েছে। তুমি ঘুমাচ্ছো। তাঁর মাসুম বান্দারা তোমার নিরাপত্তার জন্য পাহারা দিচ্ছে। তুমি গুনাহ করছো, আর তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সুস্বাস্থ্য, রোগমুক্তি এবং বালা-মুসীবত থেকে হিফাযত ভোগ করছো, খাবার হজম হচ্ছে, শরীরের অতিরিক্ত জিনিষগুলো বের হয়ে যাচ্ছে, রক্তের সঞ্চালন, অঙ্গগুলোর মধ্যে শক্তি, চোখে জ্যোতি, হিসাববিহীন দয়া তোমার প্রার্থনা ছাড়াই তোমার উপর নাযিল হচ্ছে। অতঃপর যদি তোমার মনের একান্ত ইচ্ছানুসারে কিছু দান করা না হয়, তবে কোন্ মুখে অভিযোগ করছো? তুমি কি জানো তোমার জন্য মঙ্গল কোন্ জিনিষের মধ্যে রয়েছে? তুমি কি জানো কেমন মারাত্মক বালা আগমনকারী ছিলো? কিন্তু তোমার দো'আ (ওই প্রার্থনা, যা তোমার ধারণায় ক্ববূল হয় নি,) সেটাকে দূরীভূত করেছে? তুমি কি জানো ওই দো'আর পরিবর্তে কি সাওয়ার তোমার জন্য জমা হচ্ছে? তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য। বস্তুতঃ ক্ববূল হবার এ তিনটি ধরন রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটির পূর্ববর্তী তার পরবর্তী থেকে উত্তম। অবশ্য, অবিশ্বাস এসে গেলে নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে, ধ্বংস হয়ে গেছো। আর অভিশপ্ত ইবলীস তোমাকে তার মতো করে নিয়েছে। আল্লাহ্রই পানাহ্! মহামহিম আল্লাহ্ পবিত্র।[৭৬]

৭৬ যায়লুল মুদ্দা'আ লিআহসানিল ভি'আ ঃ পৃষ্ঠা ৩০-৩২ ঃ রেযা বুক ডিপো, বেরিলী থেকে মুদ্রিত।

দো'আর উদ্দেশ্য

দো'আর মধ্যে শুধূ তোমার প্রার্থিত বস্তুটির প্রতি দৃষ্টি রাখবে না, বরং নিছক দো'আকেই মূল লক্ষ্য বলে জানবে। কারণ, তা খোদ্ ইবাদতই, বরং ইবাদতের মগজ বা সারবস্তু। প্রার্থিত বস্তু পাওয়া যাক, কিংবা না-ই যাক, মুনাজাতের তৃপ্তিটিই হচ্ছে তখনকার নগদ পাওনা। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের মালিক, পালনকর্তা।[৭৭]

বদ-দো'আ ও অভিসম্পাত করা

নিজের ও নিজের বন্ধু-বান্ধবদের সত্তা, পরিবার-পরিজন, সম্পদ ও সন্তাদেরকে বদ-দো'আ করবে না। তুমি কি জানো, কখন তা ক্ববূল হয়ে যাবে? আর বালা নাযিল হয়ে গেলে লজ্জাবোধ করবে, অনুশোচনা করবে! রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান, "নিজের সত্তার উপর বদ-দো'আ করো না! আর আপন সন্তানদের উপর বদ-দো'আ করো না! আপন সেবকদের উপর বদ-দো'আ করো না, নিজের সম্পদের উপর বদ-দো'আ করো না! এ আশঙ্কায় যে, তা ক্ববূল হবার সময়ে করা হয় কি না।[৭৮]

তিনটি দো'আ নিঃসন্দেহে মাক্ববূল ঃ ১. মজলূম বা অত্যাচারিতের দো'আ, ২. মুসাফিরের দো'আ এবং ৩. মাতা-পিতার নিজ সন্তানদের উপর বদ-দো'আ।[৭৯]

নিজের কৃতকর্মের চিকিৎসা নেই

১. একান্ত বাধ্য হওয়া ছাড়া রাতের এমন সময় ঘর থেকে বের হবে না, যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, রাস্তায় মানুষের আনাগোনা বন্ধ হয়ে যায়। সহীহ হাদীসে এর নিষেধ এসেছে। কারণ, তখন বালা-মুসীবৎ ছড়িয়ে পড়ে।
২. রাতে দরজা খোলা রাখবে না, 'বিসমিল্লাহ্' পড়া ছাড়াও বন্ধ করবে না। কারণ, তখন শয়তান তা খুলতে পারে।
৩. খানা খাওয়ার পর হাত না ধুয়ে শুয়ে পড়বে না। কারণ শয়তান তা লেহন করে এবং শ্বেতরোগ হবার আশঙ্কা থাকে।
৪. গোসলখানায় প্রস্রাব করবে না। এর ফলে প্ররোচনা (সন্দেহ) সৃষ্টি হয়।
৫. অলিন্দের নিকটে শয়ন করবে না। এমতাবস্থায় ছাদের উপর আশ্রয় না থাকলে নিচে পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে।

৭৭ যায়লুল মুদ্দা'আ লিআহসানিল ভি'আ ঃ পৃষ্ঠা ৩০-৩২ ঃ রেযা বুক ডিপো, বেরিলী থেকে মুদ্রিত।
৭৮ মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে খোযাইমাহ্।
৭৯ তিরমিযী শরীফ-এর বরাতে ঃ আহসানুল ভি'আ ঃ পৃষ্ঠা ৯২।

৬. একাকী সফর করবে না। কারণ, এতে ফাসিক্ব (মন্দ) জিন্ ও মানুষ দ্বারা ক্ষতি সাধিত হতে পারে। আর প্রতিটি কাজ কঠিন হয়ে যায়।

৭. স্ত্রী-সঙ্গমের সময় স্ত্রীর গোপানাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। কারণ, তা আল্লাহ্‌রই পানাহ্! নিজের, কিংবা সন্তানের, অথবা হৃদয় অন্ধ হয়ে যাবার কারণ হয়। স্ত্রী সহবাসের সময় কোন কথাও বলবে না। কারণ, এতে সন্তান বোবা হবার সম্ভাবনা থাকে।

৮. ফাসিক্ব, পাপাচারী, মন্দ স্বভাবের লোক এবং বদ-মাযহাব (ভ্রান্ত আক্বীদাধারী) লোকদের সাথে ওঠা-বসা করবে না। যদি করো, তবে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, ওই মন্দ সঙ্গের কুপ্রভাব থেকে বেঁচে গেছো, তবুও অপবাদের ভাগী তো অবশ্যই হয়ে যাবে।

সৎকর্মের নির্দেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ করা

সৎকর্মের নির্দেশ ও অসৎ কর্মে বাধা প্রদান না করা, অর্থাৎ কোন দলের কিছু লোক আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লার নির্দেশ অমান্য করে আর অন্যান্য লোক নিশ্চুপ থাকে এবং সাধ্যানুসারে তাদেরকে বিরত রাখে না, নিষেধ করে না, আর মনে করে-প্রত্যেকের কর্ম তার সাথে, আমাদের বাধা দেওয়ার, নিষেধ করার গরজই বা কি? অথচ এর ফলে যেই বালা আসবে, তাতে নেককারদের দো'আও ক্ববূল হবে না। এরা নিজেরা সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজে বাধাধানের মতো ফরয ছেড়ে দিয়েছিলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, হয় তো তোমরা সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজে বাধা দেবে, নতুবা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর তোমাদের অসৎকর্মপরায়ণদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেবেন। অতঃপর তোমাদের নেক্‌কার লোকেরা দো'আ করবেন, অথচ তা ক্ববূল হবে না। বায্‌যার ও ত্বাবরানী 'আল-আওসাত্ব' এর মধ্যে হযরত আবু হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এটা হাসান পর্যায়ের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৮০]

সতর্কতা ঃ কোনভাবে দো'আ ক্ববূল না হওয়া নিশ্চিত ও অকাট্য নয়। আর এর এ অর্থও নয় যে, এমতাবস্থায় দো'আ করাকে নিছক অনর্থক ও অগ্রহণযোগ্য মনে করে তা থেকে বিরত থাকবে। এটা কখনো নয়। দো'আ হচ্ছে ঈমানদারদের হাতিয়ার। দো'আ নিরাপত্তাকেই টেনে আনে। দো'আ আসমান ও যমীনের নূর। দো'আ পরম করুণাময়ের সন্তুষ্টির কারণ, বরং ওইসব বিষয় থেকে রুখে দেওয়াই উদ্দেশ্য, যেগুলো দো'আ ও ক্ববূল হবার মধ্যে অন্তরায় হয়।

৮০ আহসানুল ভি'আ' ঃ পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭ ঃ ইফাদাত-ই আ'লা হযরত বৃদ্দিসা সিররুহু।

সুতরাং ওইসব কাজ থেকে বিরত থাকা জরুরী, আর যাতে জড়িয়ে গেছো, যদি সেগুলো এখনো মওজুদ থাকে, তা অবশ্যই দূরীভূত করবে। যেমন হারাম মাল। তা যার নিকট থেকে নিয়েছো, তাকে ফেরৎ দেবে। আর যদি সে জীবিত না থাকে তবে তার ওয়ারিশকে দেবে, কিংবা তার নিকট থেকে ক্ষমা করিয়ে নেবে। তাদের কাউকে পাওয়া না গেলে সাদক্বাহ করে দেবে। আর যা হয়ে গেছে, তা থেকে তাওবা ও ইস্তেগফার এবং ভবিষ্যতের জন্য পুনরাবৃত্তি পরিহার করার বিশুদ্ধ প্রত্যয় করে নেবে। এর বরকত এর বরকত শূণ্যতাকে দূর করে দেবে। বস্তুতঃ আল্লাহর নির্দেশক্রমে, তা নিজের প্রভাব বিস্তার করবে।[৮১]

কতিপয় রোগ নি'মাতই

শরীরে কখনো কখনো জ্বর, সর্দি, মাথাব্যাথা ইত্যাদি হালকা রোগ তো বালা-ই নয়, বরং নি'মাত। এমনকি সেগুলো না হওয়াই বালা। আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের শরীরে যদি রোগ, অসচ্ছলতা না আসতো, তবে ইস্তিগ্‌ফার ও আল্লাহ্ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করতেন-লাগাম ঢিলা করে দিয়ে অবকাশ দেয়া হলো কিনা- এ ভয়ে।[৮২]

স্পিরিট কি জিনিষ?

এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরত ক্বুদ্দিসা সিররুহূ এরশাদ করেছেন, স্পিরিট নিশ্চিতভাবে মদ। মিশ্রণের কারণে উপযুক্ত ও স্বতন্ত্রভাবে মদ না হবার কারণে সেটাকে মদের অন্তর্ভুক্ত না বলার উপায় নেই। বরং এর মিশ্রণই চূড়ান্ত উত্তেজনা, কঠোরতা, নেশা ও বিপর্যয়ের কারণ। ব্রাণ্ডি (ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের মদ) ইউরোপ থেকে আসে সত্য; কিন্তু এর নেশার জোর ওই স্পিরিটের ফোঁটাগুলো দ্বারাই বৃদ্ধি করা হয়। অন্য ধরনের নব্বই ফোঁটায়, আর এর একটা মাত্র ফোঁটায়, এমনকি অন্য মদের শত ফোঁটার মতো নেশা হয়।

মদ পান করলে নেশা আসে, কিন্তু স্পিরিটের শুধু ঘ্রাণ নিলে নেশা হয়। সুতরাং তা হারামও, প্রস্রাবের মতো 'নাজাসাত-ই গলীযাহ্'ও। এটাই বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। এটার উপর ফাত্‌ওয়া।[৮৩]

৮১ আহসানুল ভি'আ ঃ পৃষ্ঠা ৬৮।
৮২ আহসানুল ভি'আ' ঃ ৭০ পৃষ্ঠা।
৮৩ আল-কাশফু শাফিয়া ঃ পৃষ্ঠা ৯০ ঃ সা'ঈদী প্রেস থেকে মুদ্রিত, রামপুর।

বায়'আত-এর অর্থ

বায়'আত মানে পরিপূর্ণভাবে বিক্রি করা। 'বায়'আত' ওই ব্যক্তির হাতে করা চাই, যার মধ্যে নিম্নলিখিত চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, অন্যথায় বায়'আত করা না জায়েয হবে ঃ

১. সুন্নী, বিশুদ্ধ আক্বীদাসম্পন্ন হবেন,
২. কমপক্ষে এতটুকু ইল্‌ম থাকা জরুরী যে, কারো সাহায্য ছাড়াই নিজের জরুরী মাসাইল কিতাব থেকে নিজেই বের করতে পারেন,
৩. তাঁর সিলসিলা (ত্বরীক্বতের শায়খদের ধারা) হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে, মাঝখানে যেনো কর্তিত না হয় এবং
৪. 'ফাসিক্ব-ই মু'লান' হবেন না। (অর্থাৎ প্রকাশ্যে পাপাচারী হবেন না)।

অনেকে বায়'আত রসম বা প্রথানুসারে করে থাকে, বায়'আতের অর্থ জানে না। বায়'আত বলে-হযরত ইয়াহ্‌য়া মান্‌য়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র এক মুরীদ নদীতে ডুবে যাচ্ছিলো। হযরত খাদ্বির (আলাইহিস্ সালাম) আত্মপ্রকাশ করলেন। আর বললেন, "তোমার হাত আমাকে দাও! আমি তোমাকে পানি থেকে বের করে আনবো।" মুরীদ আরয করলো, "এ হাত আমি হযরত ইয়াহ্‌য়া মানয়ারীকে দিয়ে রেখেছি। এখন অন্য কাউকে দেবো না"। হযরত খাদ্বির অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর হযরত ইয়াহ্‌য়া মানয়ারী আত্মপ্রকাশ করলেন এবং তাকে বের করে আনলেন। (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

বায়'আত নবায়ন

হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বরকতময় যুগেও বায়'আত নবায়ন করা হতো। খোদ্ হুযূর সাল্লাল্লাহু ত'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালমাহ্ ইবনে আক্‌ওয়া' থেকে এক বৈঠকে তিনবার বায়'আত নিয়েছেন। তিনি জিহাদে যাচ্ছিলেন। প্রথম বার হুযূরের এরশাদ অনুসারে হযরত সালমাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বায়'আত করেন। কিছুক্ষণ পর হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "সালামাহ্! তুমি বায়'আত করবে না?" তিনি আরয করলেন, "হুযূর করেছি।" হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন, "ওয়া আয়দ্বান্।"

(আবারও করো!)" তিনি পুনরায় বায়'আত করলেন। শেষ পর্যন্ত যখন সমস্ত হযরত বায়'আত করে নিলেন, তখন পুনরায় এরশাদ হলো, "সালমাহ্! তুমি বায়'আত করবে না?" আরয করলেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আমি দু'বার বায়'আত করেছি।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আয়দ্বান্।" (অর্থাৎ আবারো করো)।"

মোটকথা, হুযুর এক জলসায় হযরত সালমাহ্ থেকে তিনবার বায়'আত গ্রহণ করেছেন। তাঁর নিকট থেকে বারবার বায়'আত গ্রহণ করে তা তাকীদ করার রহস্য এ ছিলো যে, তিনি সব সময় পদব্রজে জিহাদ করতেন। আর কাফিরদের সাথে একাকী মোকাবেলা করা তাঁর জন্য কিছুই ছিলো না।[৮৪]

বায়'আত ও এর উপকারিতা

বায়'আতও দু'প্রকার ঃ

১. **বায়'আত-ই বরকত**। শুধু বরকত হাসিল করার জন্য সিলসিলায় দাখিল হয়ে যাওয়া। আজকাল সাধারণভাবে এ বায়'আতই হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ভালো নিয়্যতে করা হলে তা উপকারী। অন্যথায় অনেকের বায়'আত তো পার্থিব ও কুউদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। তা আলোচনায় আনার উপযোগী নয়। এ ধরনের বায়'আতের জন্য 'শায়খ-ই ইত্তেসাল' অর্থাৎ যাঁর হাতে বায়'আত করলে মানুষের সিলসিলা (পরম্পরা) হুযূর পুরনূর সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে মিলিত হয়। উপরোক্ত চার বৈশিষ্ট্যের ধারক হলেও যথেষ্ট।

এ বায়'আত-ই বরকত তাবার্‌রুক বা এর প্রসঙ্গে আমার অভিমত হচ্ছে-এটাও বেকার নয়; বরং উপকারী, খুবই উপকারী এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কাজে আসবে। আল্লাহ্‌র মাহবূব বান্দাদের গোলামদের দপ্তরে নাম লিপিবদ্ধ হওয়া, তাঁদের সিলসিলার সাথে মিলিত হয়ে যাওয়া মূলতঃ সৌভাগ্যই।

প্রথমত ঃ এ খাস খাস গোলামগণ এবং যাঁরা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের পথে চলেন, তাঁদের সাথে এ বিষয়ে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, **من تشبه بقوم فهو منهم** (অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।)

সাইয়্যেদুনা শায়খুশ্ শুয়ূখ শিহাবুল হক্ব ওয়াদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ' শরীফে বলেন-

واعلم أن الخرقة خرقتان : خرقة الارادة وخرقة التبرك. والاصل الذى قصده المشائخ للمريدين خرقة الارداة وخرقة التبرك تشبة بخرقة الارادة فخرقة الارادة للمريد الحقيقي وخرقة التبرك للمتشبه ومن تشبه بقوم فهو منهم.

৮৪ কাশকূল ফক্বীর ক্বাদেরী।

অর্থাৎ জেনে রেখো যে, খিরক্বাহ্ তথা বায়'আত দু'প্রকার ঃ 'খিরক্বাহ্-ই ইরাদত' ও 'খিরক্বাহ্-ই তাবাররুক'। সম্মানিত মাশাইখ মুরীদদের থেকে চান 'খিরক্বহ্-ই ইরাদত'। আর 'খিরক্বাহ্-ই তাবার্রুক' হচ্ছে সেটার সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করা মাত্র। সুতরাং প্রকৃত মুরীদের জন্য 'খিরক্বাহ্-ই ইরাদত' চাই। আর সামঞ্জস্য যারা চায় তাদের জন্য চাই 'খিরক্বাহ্-ই তাবার্রুক'। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত ঃ ওই খাস বান্দাদের সাথে এক রশিতে আবদ্ধ হওয়া যায়। কবি বলেন-

بلبل ہمین کہ قافیہ کل شود بس است

অর্থাৎ- বুলবুল পাখির জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে ফুলের সুতোয় গেঁথে গেছে।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান-

هم القوم لايشقى بهم جليسهم অর্থাৎ- তারা তো হচ্ছে এমন লোক, তাদের পাশে যে বসে সেও হতভাগা থাকে না।

তৃতীয়ত ঃ মাহবূবানে খোদা রহমতের নিশানা। তাঁরা তাদের যারা নাম নেয় তাদেরকে আপন করে নেন। আর তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখেন। হুযূর পুরনূর সাইয়্যেদুনা গাউসে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দরবারে আরয করা হলো, "যদি কেউ হুযূর! আপনার নাম নেয়, অথচ সে আপনার হাত মুবারকে বায়'আত করে নি, না আপনার খিরক্বাহ্ পরেছে, সেও কি আপনার মুরীদদের মধ্যে গণ্য হবে?" তদুত্তরে হুযূর গাউস-ই পাক এরশাদ করলেন-

من انتمى الى وتسمى بي قبله الله تعالى وتاب عليه ان كان على سبيل مكروه وهو من جملة اصحابى وان ربي عزوجل وعدني ان يدخل اصحابى واهل مذهبى وكل محب لي الجنة.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে নিজে আমার দিকে সম্পৃক্ত করে আর তার নাম আমার দপ্তরে লিপিবদ্ধ করে নেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্বূল করবেন। যদি সে কোন অপছন্দনীয় পথের উপর হয়, তবে তাকে তাওবা দান করবেন। আর সে আমার মুরীদদের দলে রয়েছে। নিশ্চয় আমার মহামহিম রব আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার মুরীদগণ, আমার সম-মাযহাব ও আমার প্রার্থীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৮৫]

৮৫ বাহজাতুল আসরার শরীফ।

২. **'বায়'আত-ই ইরাদত'**। অর্থাৎ- নিজের ইচ্ছা ও ইখতিয়ার থেকে পুরোপুরিভাবে বের হয়ে নিজেকে নিজে শায়খ ও মুর্শিদ, হাদী-ই বরহক্ব ও আল্লাহ্র প্রকৃত ওলীর হাতে একেবারে সোপর্দ করে দেওয়া, তাঁকে নিঃশর্তভাবে নিজের হুকুমদাতা, মুনিব ও ক্ষমতাপ্রয়োগকারী জানা এবং তাঁর পথ-নির্দেশনা অনুসারে চলা। তাঁর মর্জি ছাড়া কোন কদমই উঠাবে না। যদি নিজের জন্য তাঁর কোন নির্দেশ কিংবা নিজের মনে তাঁর কোন কাজ, শুদ্ধ মনে না হয়, তবে এমতাবস্থায় তাঁকে হযরত খাদ্বির আলাইস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর মতো মনে করবে। নিজের বিবেকের ত্রুটি মনে করবে। তাঁর কোন কাজ বা কথার উপর মনে মনেও আপত্তি আসতে দেবে না। নিজের প্রতিটি মুশকিল তাঁর নিকট পেশ করবে। মোটকথা, তাঁর হাতে অর্থাৎ 'জীবিতের হাতে মৃত' হয়ে থাকবে। এটা হচ্ছে- 'সালেক' বান্দাদের বায়'আত। এটাই মাশাইখ ও মুর্শিদদের উদ্দেশ্য ও কাম্য। এটাই আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা পর্যন্ত পৌঁছায়। এ ধরনের বায়'আতই হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা-ই কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে নিয়েছেন। যেমন হযরত সাইয়্যেদুনা ওবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন-

بايعنا رسول الله صلى تعالى عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشظ والمكره وان لاننازع الامر اهله.

অর্থাৎ আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এমর্মে বায়'আত করেছি যে, প্রতিটি সাচ্ছন্দ্যে ও সঙ্কটে, সুখে ও দুঃখে হুযূরের হুকুম শুনবো ও তা পালন করবো। আর মহান নির্দেশদাতার কোন কাজে আপত্তি করবো না।

শায়খ ও পথ-পদর্শকের হুকুম রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এরই হুকুম। আর রসূলের হুকুম আল্লাহর হুকুম। বস্তুতঃ আল্লাহ্র নির্দেশের মধ্যে আপত্তি উত্থাপনের কোন অবকাশই নেই। আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা এরশাদ ফরমাচ্ছেনঃ

وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الله ورسله اموا أن يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلا لامبينا. (الجزء ٢٢ : الركوع ٢)

অর্থাৎ এবং কোন মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য শোভা পায় না যে. যখন আল্লাহ্ ও রসূল কোন নির্দেশ দেন, তখন তাদের স্বীয় ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকবে। এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ অমান্য করে, সে নিশ্চয় সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট রয়েছে।[৮৬]

৮৬ পারা ২২, আয়াত-৩৬ তরজমা-কানযুল ঈমান

'আওয়ারিফ' শরীফে হযরত শায়খ শিহাব উদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন, "শায়খের নির্দেশাধীন হওয়া আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশাধীন হওয়া এবং এ বায়'আতকে জীবিত রাখারই সামিল। এটা তো শুধু ওই মুরীদের পক্ষেই সম্ভব হয়, যে নিজের প্রাণটুকু পর্যন্ত আপন শায়খ বা মুর্শিদের হাতে বন্দি করে দিয়েছে, নিজের ইচ্ছা থেকেও একেবারে বাইরে এসে গেছে, আপন ইখতিয়ার ছেড়ে দিয়ে শায়খের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে।"

তিনি আরো বলেছেন, "পীর-মুর্শিদের কাজে আপত্তি করা থেকে বিরত থাকো। এটা মুরীদদের জন্য 'প্রাণনাশক বিষ'। এমন মুরীদ খুব কমই রয়েছে, যে অন্তরে আপন শায়খের উপর কোন আপত্তি করেছে, তারপর সফলকামও হয়েছে।

শায়খের কাজগুলোর যা কিছু তার নিকট শুদ্ধ বলে মনে হয় না, সেগুলোতে সে যেনো হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর ঘটনাগুলো স্মরণ করে। কেননা, তাঁর মাধ্যমে এমন এমন কাজ সম্পন্ন হতো, যেগুলোর উপর বাহ্যতঃ কঠোর আপত্তি ছিলো। (যেমন মিসকীনদের নৌকায় ফুটো করে দেওয়া, বে-গুনাহ্ শিশুকে হত্যা করে ফেলা ইত্যাদি।) অতঃপর যখন তিনি সেগুলোর কারণ বলে দিলেন, তখন প্রকাশ পেলো যে, সেগুলোই সঠিক ছিলো, যেগুলো তিনি করেছেন। অনুরূপ মুরীদেরও একথা বিশ্বাস রাখতে হবে যে, শায়খের যে কাজ আমার নিকট শুদ্ধ ও সঠিক বলে মনে হচ্ছে না, শায়খের নিকট সেটার সত্যতার পক্ষে অকাট্য প্রমাণও রয়েছে।

হযরত ইমাম আবুল ক্বাসেম ক্বোশায়রী তার 'রিসালাহ'য় লিখেছেন, হযরত আবূ সাহল সা'লূকী বলেছেন- من قال لاستاذه لم لايفلح ابدا (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন পীরকে কোন কথায় 'কেন' বলবে, সে কখনো কামিয়াব হবে না।" আমরা আল্লাহ্‌র মহান দরবারে ক্ষমা ও নিরপত্তার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি।[৮৭]

শাজরা শরীফ পড়ার উপকারিতা

শাজরা পড়ার কয়েকটা উপকার রয়েছে ঃ

১. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত নিজের মিলিত হওয়ার সনদ মুখস্থ বা হিফাযত করা হয়।
২. সালেহীনকে স্মরণ করা হয়, যা রহমত নাযিল হবার কারণ।
৩. নিজের নি'মাত-প্রাপ্তির মাধ্যমে বুযুর্গদের নামে নামে ঈসালে সাওয়াব করা হয়। ফলে তা তাঁদের দরবারে কৃপাদৃষ্টি পাবার মাধ্যম হয়ে যায়।

৮৭ ফাতাওয়া-ই আফরীক্বিয়্যাহ ঃ পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৭

৪. নিরাপদ থাকাবস্থায় যখন তাঁদের নাম নিতে থাকবে, তখন তাঁরাও (সিলসিলার বুযুর্গগণ) মুসীবতের সময় তাকে রক্ষা করবেন।[৮৮]

শরী'আত ও ত্বরীক্বত

১. একথা বলা যে, শরীয়ত হচ্ছে কিছু সংখ্যক বিধি-বিধান, ফরয, ওয়াজিব, হালাল ও হারামের নাম, নিছক অন্ধপনাই। শরীয়ত হচ্ছে সমস্ত বিধি-বিধান, দেহ ও প্রাণ, রূহ ও হৃদয় এবং সমস্ত উলূম-ই ইলাহিয়্যাহ্ এবং অপরিসীম জ্ঞান-বিজ্ঞানেরই ধারক। তন্মধ্যে এক টুকরার নাম হচ্ছে-ত্বরীক্বত ও মা'রিফাত। সুতরাং আল্লাহর সমস্ত সম্মানিত ওলীর অকাট্য ঐকমত্য অনুসারে সমস্ত হাক্বীক্বতকে পবিত্র শরীয়তের উপর পেশ করা ফরয। যদি শরীয়ত অনুসারে হয়, তাহলে গ্রহণযোগ্য, অন্যথায়

বিশেষ জ্ঞাতব্য

বায়'আত ও খিলাফত সম্পর্কে অন্যান্য মাসআলা-মাসাইল জানতে হলে আ'লা হযরত ফাযিলে বেরলভী কুদ্দিসা সিরূহুল আযীয-এর রিসালাহ্ 'নিক্বাউস্ সালাফাহ্ ফী আহকামিল বায়'আত ওয়াল খিলাফাহ্' (১৩১৯ হিজরী) পর্যালোচনা করুন!

পরিত্যাজ্য ও ঘৃণিত। সুতরাং নিশ্চিত ও অকাট্য কথা হচ্ছে-শরীয়তই মূলবস্তু, শরীয়তই মূল ভিত্তি। 'শরীয়ত' রাস্তাকে বলা হয়। আর 'শরীয়ত-ই মুহাম্মদিয়্যাহ্' (আলা সাহিবিহাস্ সালাতু ওয়াত্ তাহিয়্যাহ্)-এর অনুবাদ হচ্ছে-'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রাস্তা।'

এটা অকাট্যভাবে ব্যাপক ও নিঃশর্ত, কয়েকটা মাত্র দৈহিক বিধানের মধ্যে সীমবদ্ধ নয়। এটা হচ্ছে ওই রাস্তা যে, পাঁচ ওয়াক্বত প্রতিটি নামাযে, বরং প্রতি রাক্'আতে সেটা চাওয়া ও সেটার উপর অটল ও স্থির থাকার জন্য দো'আ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব বা অপরিহার্য। এরশাদ করেছেন- اهدنا الصراط المستقيم (অর্থাৎ আমাদেরকে সরল পথ তথা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর পথে চালাও এবং তাঁর শরীয়তের উপর অটল রাখো।)

৮৮ আহকাম-ই শরীয়ত ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৮০, সামনানী কুতুবখানা মীরাঠ।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, ইমাম আবুল আলিয়া এবং ইমাম হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম বলেন-

الصراط المستقيم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وصاحباه.

(حاكم ابن جرير وابن ابي حاتم وابن عدي وابن عساكر)

অর্থাৎ 'সেরাত্ব-ই মুস্তাক্বীম' মানে মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর ফারূক্ব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)।

এটা হচ্ছে ওই রাস্তা, যার শেষ ও চূড়ান্ত হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা। ক্বোরআন-ই আযীমে এরশাদ ফরমায়েছেন- **ان ربى على صراط مستقيم** (অর্থাৎ নিশ্চয় এ সোজা-সরল পথে আমার রবকে পাওয়া যায়।) এটা হচ্ছে ওই রাস্তা, যার বিরোধী হচ্ছে-বদ-দ্বীন ও পথভ্রষ্ট। ক্বোরআনে আযীমে এরশাদ হয়েছে-

وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصكم به لعلكم تتقون

অর্থাৎ (আল্লাহ্ পাক আয্যা ওয়া জাল্লা রুকূ'র শুরু থেকে শরীয়তের বিধানাবলী বর্ণনা করে এরশাদ ফরমাচ্ছেন) আর এও যে এটা হচ্ছে আমার সরল পথ। সুতরাং সেটার অনুসরণ করো এবং ভিন্ন পথে চলো না। এটা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তিনি তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যেনো তোমরা খোদাভীতি অর্জন করো। [৬:১৫৩, তরজমা কানযুল ঈমান।][৮৯]

দেখো, ক্বোরআন-ই আযীম পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, শরীয়তই শ্রেফ ওই রাস্তা, যা দিয়ে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা যায়। আর সেটা ব্যাতীত যতো রাস্তা দিয়েই মানুষ চলবে, সে আল্লাহ্র পথ থেকে বহু দূরে সিটকে পড়বে।

২. কারো একথা বলা যে, ত্বরীক্বত নাম হচ্ছে- আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার, নিছক পাগলামী ও মূর্খতা। প্রতিটি স্বল্পশিক্ষিত মানুষও জানে যে, ত্বরীক্ব, ত্বরীক্বাহ্ ও ত্বরীক্বত 'পথ'কে বলা হয়, 'পৌঁছে যাওয়া'কে নয়। সুতরাং 'ত্বরীক্বত' পথেরই নাম। এখন যদি তা শরীয়ত থেকে পৃথক হয়, তা হলে ক্বোরআন-ই করীমের সাক্ষ্য অনুসারে, তা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাবে না, বরং পৌঁছাবে শয়তান পর্যন্ত; জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে না, বরং নিয়ে যাবে জাহান্নামে।

৩. ত্বরীক্বতে যা কিছু উন্মুক্ত হয়, তা শরীয়তের অনুসরণের কারণেই হয়, অন্যথায় শরীয়তের অনুসরণ ব্যতীত বড় বড় 'কাশ্ফ' সংসারত্যাগী পুরোহিত, বৈরাগী ও সন্যাসীদেরও হয়ে থাকে। অতঃপর তারা কোথায় নিয়ে যায়? তারা ওই মহা আগুন ও কঠিন শাস্তি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

৮৯ পারা ৮ ঃ রুকূ' ৬। তরজমা-কানযুল ঈমান

৪. শরীয়ত হচ্ছে প্রস্রবণ আর ত্বরীক্বত হচ্ছে তা থেকে বের হওয়া একটি সমুদ্র; বরং শরীয়ত এ উদাহরণের চেয়েও ঊর্ধ্বে। কারণ প্রস্রবণ থেকে পানি বের হয়ে সমুদ্র হয়ে যেসব জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণ পানি পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তা ওই প্রস্রবণের মুখাপেক্ষী নয়, না তা থেকে উপকার গ্রহণের জন্য তখন ওই মূল উৎসের প্রয়োজন হয়; কিন্তু শরীয়ত হচ্ছে পানির ওই উৎস যে, তা থেকে উৎসারিত সমুদ্র অর্থাৎ 'ত্বরীকত'-এর প্রতিটি মুহূর্তে সেটার প্রয়োজন হয়। উৎসের সাথে সেটার সম্পর্ক ছিন্ন হলে শুধু এতটুকু নয় যে, আগামীর জন্য সাহায্য মওকূফ হয়ে যাবে; বরং এ পর্যন্ত যতটুকু পানি এসেছে, কয়েকদিন যাবত পান ও গোসল করা, ক্ষেত ও বাগানগুলোতে সেচন করা যাবে মাত্র! না না, উৎসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হতেই এ সমুদ্র তাৎক্ষণিকভাবে বিলীন হয়ে যাবে। ফোঁটা তো দূরের কথা আর্দ্রতার নাম মাত্রও দৃষ্টিগোচর হবে না। না না, আমি ভুল করেছি। আহা! যদি এতটুকুই হতো যে, সমুদ্র শুষ্ক হয়ে যেতো, পানি বিলীন হয়ে যেতো, ক্ষেত ফ্যাকাশে হয়ে যোতো, মানুষ পিপাসায় কাতরাতো! কখনো নয়, বরং এখানে এ বরকতময় উৎসের (প্রস্রবণ) সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবার সাথে সাথে এসব সমুদ্র 'ওয়াল বাহরুল মাসজূর' (অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত সমুদ্র) হয়ে লেলিহানরূপী আগুন হয়ে যায়, যার লেলিহানের কবল থেকে বাঁচার জন্য কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায় না। অতঃপর যদি ওই লেলিহান প্রকাশ্য চোখে দেখতো, তবে যেসব সম্পর্ক ছিন্নকারী জ্বলে-পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিলো, ততটুকু জ্বলার পর অবশিষ্টটুকু জ্বলা থেকে বেঁচে যেতো। তাদের এমন মন্দ পরিণতি দেখে শিক্ষালাভ করতো! কিন্তু নয়। তারা তো **نار الله المؤقدة التي تطلع على الافئدة** (আল্লাহর প্রজ্জ্বলিতকৃত আগুন, যা হৃদয়গুলোর উপর চড়ে বসে)। ভিতর থেকে হৃদয় জ্বলে গেছে, ঈমান মাটি হয়ে গেছে, জ্বলে কালো হয়ে গেছে। আর প্রকাশ্যত ওই পানি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। দেখতে সমুদ্র মনে হচ্ছে, কিন্তু ভিতরে আগুনের লেলিহান।

আহ্! আহ্! আহ্! এ অন্তরাল লক্ষ লক্ষ লোককে ধ্বংস করেছে। সুতরাং শরীয়ত প্রস্রবণ ও সমুদ্রের উদাহরণের চেয়েও বেশী ঊর্ধ্বে। ওয়া লিল্লাহিল মাসালুল আ'লা।

৫. শরীয়তের প্রয়োজন একেকজন মুসলমানের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে, প্রতিটি পলকে, প্রতিটি মুহূর্তে আমৃত্যুই; আর ত্বরীকতে যারা পা রাখে তাদের জন্য আরো বেশী প্রয়োজন। বস্তুতঃ রাস্তা যতোই সরু ও বন্ধুর হয়, পথপ্রদর্শকেরও ততোবেশী প্রয়োজন হয়। সুতরাং হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর সাইয়্যেদ-ই আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছে-

المتعبد بغير فقه كالحمار في الطاحون.

قصم ظهري اثنان جاهل متنسك وعالم منهتك

অর্থাৎ- ফিক্বহ্ ব্যতীত ইবাদতপরায়ণ তেমনি যেমন চাক্কি টানার গাধা; কষ্ট তো করে, কিন্তু লাভ নেই।[৯০]

হযরত মাওলা আলী কার্‌রামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহুল করীম বলেছেন-

(অর্থাৎ- দু'ব্যক্তি আমার পিঠ ভেঙ্গেছে, অর্থাৎ ওই দু'জন চিকিৎসার অনুপযোগী বালার মতোই ঃ ১. জাহিল আবিদ এবং ওই আলিম, যে দুঃসাহসিকভাবে প্রকাশ্যে গুনাহ্‌র কাজে লিপ্ত হয়।[৯১]

শরীয়ত ও ত্বরীকত পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন দু'টি পথ নয়, বরং শরীয়তের অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছানো অসম্ভব। বান্দা কখনো যে কোন ধরনের সাধনা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাক না কেন, ওই মর্যাদায় পৌঁছতে পারে না যে, তার উপর থেকে শরীয়তের বিধানাবলী তুলে নেওয়া হবে! আর তাকে লাগামহীন ঘোড়া ও নাকে রশি বিহীন উট করে ছেড়ে দেয়া হবে!

'সূফী' হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে আপন প্রবৃত্তিকে শরীয়তের অনুসারী করে, ওই ব্যক্তি নয়, যে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে শরীয়ত ছেড়ে দেয়। শরীয়ত হচ্ছে খাদ্য আর ত্বরীক্বত হচ্ছে শক্তি। যখন আহার বর্জন করা হয়, তখন শক্তি আপ্‌সে বিদায় নেয়। শরীয়ত হচ্ছে আয়না আর ত্বরীক্বত হচ্ছে দৃষ্টি। চোখ ফোঁড়ে দিয়ে তাতে দৃষ্টির কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে যাবার পর যদি শরীয়তের অনুসরণ না করলেও চলতো, তবে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং ইমামুল ওয়াসিলীন (যাঁরা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছেছেন, তাঁদের ইমাম) হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহুল করীম এর বেশী উপযোগী হতেন।

এমন তো হন নি, বরং যতো বেশী নৈকট্য হাসিল হয়, শরীয়তের বিধানাবলী ততো বেশী কঠিন হয়ে যায়। حسنات الابرار سيآت للمقربين অর্থাৎ-'নেক্‌কার বান্দাদের সৎকার্যাদিও নৈকট্যধন্য বান্দাদের জন্য গুনাহ্‌র শামিল।'[৯২]

৯০ আবূ নু'আঈম কৃত 'হিলইয়াহ'

৯১ মাক্বাল-ই 'উরাফা বই'যায-ই শরা' ওয়া ওলামা' ঃ পৃষ্ঠা ৩-৮। স্যাম্পানী প্রেস, মিরাঠ থেকে মুদ্রিত।

৯২ ই'তিক্বাদুল আহবাব ঃ পৃষ্ঠা ২৭, ইদারা-ই ইশা'আত-ই রেযা, বেরিলী শরীফ থেকে মুদ্রিত।

ইল্‌ম বিহীন সূফী

আউলিয়া-ই কেরাম বলেন, "মূর্খ সূফী শয়তানের হাসির খোরাক।" পক্ষান্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান-

فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد.

অর্থাৎ- একজন ফক্বীহ্ এক হাজার আবিদ থেকেও শয়তানের উপর ভারী।[৯৩]

ইলমবিহীন সাধনাকারীদেরকে শয়তান আঙ্গুল দ্বারা নাচায়, মুখে লাগাম ও নাকে রশি লাগিয়ে যেদিকে ইচ্ছা টেনে বেড়ায়। وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا অর্থাৎ তারা মনে করে তারা ভালো কাজ করছে।

হযরত সাইয়্যেদুনা জুনায়দ বাগদাদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "আমার পীর হযরত সারিউস্ সাক্বাত্বী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমাকে এ বলে দো'আ দিয়েছেন-

جعلك الله صاحب حديث صوفيا ولاجعلك صوفيا صاحب حديث

(احيآء العلوم: جـ ١ : صـ ١٣).

অর্থাৎ - আল্লাহ্ তোমাকে হাদীস শরীফের জ্ঞানী করে সূফী করুন এবং হাদীসবেত্তা হবার পূর্বে যেনো তোমাকে সূফী না বানান![৯৪]

হযরত ইমাম গায্‌যালী এর ব্যাখ্যায় বলছেন-

اشارة الى ان من حصل الحديث والعلم ثم تصوف افلح ومن تصوف قبل العلم خاطر بنفسه.

(احيآء العلوم : جـ ١ : صـ ١٣)

অর্থাৎ - হযরত সারিউস্ সাক্বাত্বী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি প্রথমে ইলম ও হাদীস শরীফ শিক্ষা করে তাসাওফে কদম রাখলো, সে সফলকাম হয়েছে। আর যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার পূর্বে সূফী হতে চেয়েছে, সে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলেছে। (আল্লাহ্‌রই পানাহ্)।[৯৫]

৯৩ তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্।

৯৪ ইহ্‌য়াউল উলূম ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১৩।

৯৫ ইহ্‌য়াউল উলূম ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১৩

হযরত সাইয়্যেদী আবুল ক্বাসেম জুনাইদ বাগদাদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لايقتدى به في هذا الامر لان علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة.

(رساله قشيريه : مطبوعة مصر : صـ ٢٤)

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি না ক্বোরআন হিফয করেছে, না হাদীস শরীফ লিখেছে, (অর্থাৎ যে ব্যক্তি শরীয়তের ইলম সম্পর্কে অবগত নয়) ত্বরীক্বতের মধ্যে তাঁকে অনুসরণ করা যাবে না। তাকে নিজের পীর বানাবে না। কারণ, আমাদের এ ইলমে ত্বরীক্বত একেবারে কিতাব ও সুন্নাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।[৯৬]

হযরত সাইয়্যেদুনা সারিউস্ সাক্বাত্বী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন- "তসাওফ তিনটি গুণের নাম- ১. তাঁর 'মা'রিফাতের নূর' তার 'পরহেয্গারী'র নূরকে নির্বাপিত করবে না, ২. গোপনীয় জ্ঞান থেকে এমন কোন কথা বলবে না, যা ক্বোরআন ও হাদীস শরীফের প্রকাশ্য অর্থের পরিপন্থী হবে এবং ৩. তার কারামতসমূহ যেন তাকে ওইসব বিষয়ের অন্তরাল থেকে বের করে না আনে, যেগুলোর পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে আসাকে আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন।"[৯৭]

হযরত শায়খ শেহাব উদ্দীন সোহ্রাওয়ার্দী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

كل حقيقة ردتها الشريعة فهي ازندقة

(عوارف المعارف : المجلد الاول : صـ ٤٣)

অর্থাৎ- যেই হাক্বীক্বতকে শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে সেটা হাক্বীক্বত নয়, বরং বে-দ্বীনীই।[৯৮]

দুরূদ শরীফ সংক্ষিপ্ত করা!

صلى الله تعالى عليه وسلم (সাল্লাল্লাহ্ তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম)- এর স্থলে **صلعم** (সাল্'আম, সলঃ, স. ইত্যাদি) লিখা জঘন্য অবৈধ। এটা সাধারণ তো সাধারণ, দীর্ঘ ১৪ শতাধিক কাল যাবৎ অনেক বড়, শীর্ষস্থানীয় ও নামীদামী মানুষ বলে দাবীদারদের মধ্যেও এ রোগটি ছড়িয়ে পড়েছে- কেউ লিখেন **صلعم** (সাল্'আম), কেউ লিখেন **صللعم** (সালাল'আম), কেউ লিখবেন **ص** (সোয়াদ)। (আমাদের বাংলায়, সলঃ সাঃ, সঃ ইত্যাদি) আবার কেউ **عليه السلام** (আলাইহিস্ সালাম)-এর স্থলে **ع م عم** (আইন- মীম কিংবা আলাদা করে আইন ও মীম) লিখে থাকে। (আমাদের বাংলায় লিখেন- আঃ।) এক ফোঁটা কালি কিংবা এক আঙ্গুল পরিমাণ কাগজ অথবা কয়েক

৯৬ রিসালাহ্-ই ক্বোশাইরয়াহ্ ঃ মিশরে মুদ্রিত ঃ পৃষ্ঠা ২৪।
৯৭ রিসালা-ই ক্বোশাইরিয়াহ্ ঃ পৃষ্ঠা ১৩।
৯৮ আওয়ারিফুল মা'আরিফ ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৪৩।

সেকেণ্ড সময় বাঁচানোর জন্য কতো বড় বড় বরকত থেকে তারা দূরে সিট্কে পড়ছে এবং বঞ্চিত ও হতভাগা হচ্ছে!

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ বলেন, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম দুরূদ শরীফকে এমনি সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে লেখার কুপ্রথা চালু করেছিলে, তার হাত কেটে ফেলা হয়েছে-

من كتب عليه السلام بالهمزة والميم يكفر لانه تخفيف وتخفيف الانبيآء كفر بلاشك.

অর্থাৎ কোন নবীর নামের সাথে দুরূদ ও সালাম এভাবে সংক্ষিপ্ত করে লিপিবদ্ধকারী কাফির হয়ে যায়, কারণ এতে তঁদের মর্যাদা খাটো করা হয়। নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস সালাম-এর মর্যাদাকে হাল্কা বা খাটো করে দেখানো নিঃসন্দেহে কুফর। এতে সন্দেহ নেই যে, যদি আল্লাহরই পানাহ! ইচ্ছাকৃতভাবে নবীর মানহানি করা হয়, তবে তা অকাট্যভাবে কুফর। উপরোক্ত বিধান এ ধরনের কর্মের জন্য প্রযোজ্য। এসব লোক যদি নিছক অলসতা, ক্লান্তি ও অজ্ঞতার কারণে এমনি করে থাকে, তাহলে তাদের বেলায় এ বিধান বর্তাবে না। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, অমঙ্গল, দুর্ভাগ্য ও মন্দ অদৃষ্ট তাদের জন্য আছেই।

আমার বক্তব্য হচ্ছে- প্রকাশ থাকে যে, কলমও একটি রসনা। **صلى الله تعالى عليه وسلم** (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর স্থলে একটি অনর্থক শব্দ **صلعم** (সাল'আম, সলঃ, সঃ ইত্যাদি) লিখা তেমনি হলো, যেমন হুযূরের পবিত্রতম নামের সাথে দুরূদ শরীফের স্থলে আগড়ম বাগড়ম কিছু বকাবকি করা হলো! আল্লাহ আযযা শানুহ এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السمآء بما كانوا يفسقون. (الجزء ١ : السورة ٢ والاية ٥٩)

অর্থাৎ যে কথার নির্দেশ হয়েছিলো যালিমগণ সেটা বদলে দিয়ে অন্য কিছু করে নিয়েছে। তখন আমি আসমান থেকে তাদের উপর আযাব নাযিল করেছি-তাদের ফাসেক্বীর বদলা স্বরূপ। (পারা-১, সুরা-২, আয়াত -৫৯)

ওখানে বনী ইস্রাঈলকে বলা হয়েছিলো **قولوا حطة** (এভাবে বলো, আমাদের গুনাহগুলোর ক্ষমা হোক!) তারা বলেছিলো, **حطنة** (আমরা যেন গম পাই!) এ শব্দ তো অর্থবোধক ছিলো। আর এখানে আল্লাহর একটি নি'মাতের যিকর ছিলো; কিন্তু এতটুকু পরিবর্তন করার অপরাধে তাদের উপর আযাব নাযিল হয়েছে। আর এখানে হুকুম হচ্ছে- **يايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما**

(অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, আপন নবীর উপর দুরূদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো!)

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ابدا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুমা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া

সোয়াহবিহী আবাদা)

আর এ হুকুম, চাই ওয়াজিব করার জন্য হোক কিংবা মুস্তাহাব স্থির করার জন্য হোক, প্রত্যেকবার পবিত্রতম নামটি শুনলে, মুখে নিলে কিংবা কলম দিয়ে লিখলে এটা বর্তাবেই। লিপিতে সেটা পালন করা পবিত্রতম নামের সাথে' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম' লিখার মধ্যেই ছিলো । সেটাকে পরিবর্তিত করে صلعم صللعم صـ ع م বাংলায় ,সলঃ, সাঃ,সঃ ইত্যাদি) করে নিয়েছে, যেগুলো কোন অর্থই প্রদান করে না। এ জন্য কি তারা আযাব নাযিল হবার আশঙ্কা করে না? আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পানাহ চাচ্ছি!

এটা তো দুরূদের স্থান, যার মহত্ব এমন পর্যায়ের যে, এটাকে হালকা করে দেখার মধ্যে কুফর হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তা'ছাড়া, সাহাবা ও আউলিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম-এর পবিত্র নামগুলোর সাথে রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র স্থলে رضـ (বাংলায়, রাঃ) লিখাকে ওলামা-ই কেরাম মাকরূহ ও বঞ্চিত হবার কারণ বলেছেন। সাইয়্যেদুনা আল্লামা ত্বাহত্বাভী বলেন-

يكره الرمز بالترضي بالكتابة بل يكتب ذلك كله بكماله

অর্থাৎ লিখার মধ্যে 'রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু' সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা মকরূহ, বরং পূরোপুরিই লিখবে।

ইমাম নাওয়াভী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

ومن اغفل هذا حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এতে অলসতা করেছে, সে মহা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়েছে এবং মহা অনুগ্রহ তার হাতছাড়া হয়েছে। (মহান আল্লাহ্‌রই পানাহ্)

এভাবে 'কুদ্দিসা সিররুহু', 'রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'-এর স্থলে ق ح কিংবা লিখা বোকামী ও বরকত থেকে বঞ্চিত থাকারই নামান্তর । এমনি করা থেকে বিরত থাকা চাই। আল্লাহ তা'আলা ভালো কাজ করার তাওফীক্ব দিন! আমীন!![৯৯]

সাজদার নিশান

এ প্রসঙ্গে গবেষণালব্দ অভিমত হচ্ছে- দেখানোর জন্য স্বেচ্ছায় এ নিশান সৃষ্টি করে নেওয়া অকাট্যভাবে হারাম ও গুনাহ-ই কবীরাহ। আর ওই নিশান আল্লাহরই পানাহ, জাহান্নামের উপযোগী হবারই নিশান-যতক্ষণ না তাওবা করে নেয় ।আর যদি এ নিশান বেশী সাজদা করার কারণে হয়ে যায়,আর ওই সাজদাও যদি লোকদেখানোর জন্য ছিলো,তবে সাজদাকারী জাহান্নামী। আর যদিও এ নিশান খোদ অপরাধ নয়, কিন্তু অপরাধ করার কারণে পয়দা হয়েছে ।সুতরাং তা জাহান্নামী হবারই নিশান। আর যদি ওই সাজদা নিষ্ঠাপূর্ণভাবে ও আল্লাহর ওয়াস্তে ছিলো, কিন্তু এ নিশান হয়ে যাওয়ায় মনে মনে এ জন্য খুশী হয়েছিলো যে, লোকজন তাকে দেখে আবিদ ও সাজদাপরায়ণ মনে করবে,

৯৯ ফাতাওয়া-ই অফ্রীক্বিয়াহ্ ঃ পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬, রেযভী প্রেস, বেরিলী থেকে মুদ্রিত।

তবে তো রিয়া এসে গেলো আর এ নিশানও তার জন্য নিন্দনীয় হয়ে গেলো । আর যদি তার সে দিকে নজরই না থাকে, তবে এ নিশান প্রশংসনীয় নিশান। বস্তুতঃ এক দলের মতে, আয়াত -ই করীমাহ্

سيماهم في وجوههم من اثر السجود (الجزء ٢٦ : السورةالفتح ٤٩)

(অর্থাৎ তাদের চেহারায় তাদের চিহ্ন (সাজদার নিশান)[১০০] এর মধ্যেই তার প্রশংসা মওজুদ রয়েছে। আশা করা যায় যে, কবরে ফিরিশতাদের জন্য তার ইমান ও নামাযের নিশানা হবে। বস্তুতঃ ক্বিয়ামতের দিন এ নিশান সূর্যের চেয়েও বেশী নূরানী (উজ্জ্বল) হবে-যদি আক্বীদা আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'য়াতের মতো সহীহ ও হক্বক্বানী হয়। অন্যথায় বদ-দ্বীন, গোমরাহ্‌র কোন ইবাদতের প্রতি দৃষ্টিপাতই করা হবে না।

যেমন-ইবনে মাজাহ্ ইত্যাদির হাদীস শরীফসমূহ্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটা হচ্ছে ওই নিছক দাগ, যাকে খারেজীদের আলামত বলা হয়েছে।

মোটকথা, বদ-মযহাব লোকদের কপালের দাগ নিন্দনীয়, আর সুন্নীর মধ্যে উভয় সম্ভাবনা থাকে- রিয়া থাকলে নিন্দনীয়, অন্যথায় প্রশংসনীয়। অবশ্য, কোন সুন্নীর বিরুদ্ধে ওই রিয়ার অপবাদ গড়ে নেওয়া তদপেক্ষাও বেশী মন্দ ও প্রত্যাখ্যাত। কারণ, মন্দ ধারণার চেয়ে বড় কোন মিথ্যা কথা নেই। একথা এরশাদ করেছেন আমাদের সরদার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ্‌ই সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন।[১০১]

বিদ'আত কি?

ওহে মুসলিম সমাজ! এ মহা উপকারী কথা যেনো মনে থাকে- কথায় কথায় ধিক্কৃত ওহাবীদের উল্টো দাবী থেকে বাঁচুন! ওইসব খবীসের বড়জোর দৌড় হচ্ছে এতটুকুই- 'অমুক কাজ বিদ'আত', 'নব আবিস্কৃত', 'পূর্ববর্তীদের থেকে প্রমাণিত নয়', 'সেটার প্রমাণ হাযির করো'। এসবের জবাব হচ্ছে এটাই-তোমরা অন্ধ আর কুঁজো। দু'টি কথার মধ্যে একটার হলেও প্রমাণ দেওয়া তোমাদেরই দায়িত্ব।

সে কাজটার কি সত্তার মধ্যে কোন দোষ আছে, না পবিত্র শরীয়ত সেটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে? যখন না শরীয়ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, না ওই কাজে কোন দোষ আছে, তখন তা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম, বরং ক্বোরআন করীমের এরশাদ অনুসারে জায়েয।

১০০ পারা ২৬ ঃ সূরা-৪৮ ঃ আয়াত - ২৯

১০১ ফাতাওয়া-ই আফরীক্বিয়্যাহ ঃ পৃষ্ঠা ৬৩।

দার-ই কুত্বনী (মুহাদ্দিস) আবূ সা'লাবাহ্ খাসানী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكو هاو حدد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشيآء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها

অর্থাৎ নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ্ কিছু বিষয় ফরয করেছেন। সেগুলো ছেড়ে দিও না। কিছু হারাম করেছেন। সেগুলোর ক্ষেত্রে দুঃসাহস দেখিও না। আর কিছু সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেগুলো অতিক্রম করো না। কিছু জিনিষের কোন বিধান স্বেচ্ছায় উল্লেখ করেন নি। সেগুলো খুঁজে বের বের করার চেষ্টা করো না।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سئل عن شئ لم يحرم على الناس فحرم من اجل مسئلته

অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে মুসলমানদের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধী হচ্ছে ওই লোকটি, যে এমন কোন কথা জিজ্ঞাসা করেছে, যা জিজ্ঞাসা করার কারণে হারাম হয়ে গেছে।

অথাৎ জিজ্ঞাসা না করলে এতদ্ ভিত্তিতে যে, শরীয়তে সেটা উল্লেখ করা হয় নি, জায়েয থেকে যেতো। কিন্তু সে জিজ্ঞাসা করে তা না-জায়েয করে নিয়েছে এবং মুসলমানদের উপর চপিয়ে দিয়েছে।

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ হযরত সালমান ফার্সী রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ماحرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفاعنه.

অর্থাৎ যা কিছু আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা আপন কিতাবে হালাল করেছেন, তা হালাল এবং যা কিছু আল্লাহ্ আপন কিতাবে হারাম করেছেন, তা হারাম। আর যা উল্লেখ করেন নি তা মাফ।

তা'ছাড়া, আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

يايها الذين امنوا لاتسئلوا عن اشيآء ان تبد لكم تسؤكم وان تسئلوه عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. عفا الله عنها والله غفور حليم.

(الجزء ٧ : السورة المادة-الاية ١٠١)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমনসব বিষয় প্রশ্ন করো না যেগুলো তোমাদের আজ প্রকাশ করা হলে, তোমাদের খারাপ লাগবে। আর যদি ওইসব বিষয় ওই সময়ে জিজ্ঞাসা করো, যখন ক্বোরআন অবতীর্ণ হচ্ছে, তবে তা তোমাদের উপর প্রকাশ করে দেওয়া হবে। আল্লাহ সেগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন। এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল।[১০২] (সূরা-মাইদাহ্ : ১৪১, তরজমা-কানযুল ঈমান)

এ আয়াত শরীফ ওইসব হাদীস শরীফের সত্যায়ন ও স্পষ্ট এরশাদ যে, শরীয়ত যে কথা উল্লেখ করে নি, তা ক্ষমার মধ্যে রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কালাম-ই মজীদ অবতীর্ণ হচ্ছিলো, সম্ভাবনা ছিলো যে, যদি ক্ষমার উপর কৃতজ্ঞ না রয়ে কেউ প্রশ্ন করে বসতো, তবে ওই প্রশ্নের কুফল স্বরূপ তা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হতো। এখন তো ক্বোরআন করীম নাযিল হয়ে গেছে, দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, এখন নতুন কোন হুকুম আসার নেই। শরীয়ত যতো কিছুর নির্দেশ দিয়েছে এবং নিষেধ করেনি সেগুলোর ক্ষমা তথা বৈধতা নির্ধারিত হয়ে গেছে। ওইগুলো আর পরিবর্তিত হবে না।[১০৩]

যাদেরকে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা নিষেধ

হযরত শায়খ-ই আকবার রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'ফুতূহাত'-এ লিখেছেন, যাঁদের সঙ্গের কারণে মানুষ অহঙ্কারী হয়ে যায়, অথচ অহঙ্কারীর ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, (আল্লাহ্ তা'আলারই পানাহ্!) (তাদেরকে) যদি এমন অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করা হয়, যেগুলো তাদের সাথে সম্পৃক্ত, অথবা বর্তমানকার ঘটনা, যা সম্পর্কে সে গিয়ে জানতে পারে, মোটকথা এমন কথা যে, তাদের পক্ষে গায়ব বা অদৃশ্য নয়, তাহলে জায়েয। আর যদি গায়বের ওই কথা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, যা অনেক লোক জ্বিন্ হাযির করে বশীভূত জিনকে জিজ্ঞাসা করে- অমুক মুক্বাদ্দামায় ফলাফল কি হবে? অমুক কাজের পরিণতি কি হবে? এটা হারাম এবং এটা 'গণনা'র একটা শাখা, বরং তদপেক্ষাও মন্দ।

গণনাশাস্ত্র প্রয়োগের যুগে জিনেরা আসমান পর্যন্ত যেতে পারতো। তারা ফিরিশ্তাদের কথাবার্তা শোনতো- তাঁদের নিকট কোন্ কাজটি পৌঁছেছে, আর তাঁরা তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে কি আলোচনা করতেন জিনেরা চুরি করে তা শুনে আসতো। আর সত্যের সাথে নিজের মন থেকে মিথ্যাও মিশ্রিত করে গণকদেরকে বলতো। তন্মধ্যে যে কথাগুলো সত্য হতো, সেগুলোই মাত্র বাস্তবায়িত হতো। কিন্তু হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র যুগ থেকে এর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

১০২ পারা-৭ ঃ রুকূ - ৪

১০৩ ফতোয়া-ই আফরীক্বিয়্যাহ্ ঃ পৃষ্ঠা ৯৯-১০০।

আসমানগুলোতে পাহারা বসিয়ে দেওয়া হলো। এখন জিনের ক্ষমতা নেই শোনার। যখনই যায় তখন ফিরিশতাগণ তাকে আগুনের পিণ্ড নিক্ষেপ করেন। এর বর্ণনা সূরা-ই জিন্ শরীফে আছে। সুতরাং এখন জিন্ গায়ব বা অদৃশ্য সম্পর্কে কিছুই জানে না। সুতরাং তাদের নিকট ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞাসা করা যুক্তি ও বিবেকমতেও বোকামী, শরীয়ত মতে হারাম, আর তারা গায়ব জানে বলে বিশ্বাস করা কুফর। মুসনাদে আহমদ ও সুনান-ই আরবা'আহ্য় হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

من اتى كاهنا فصدقه بما يقول او اتى امرأة حائضا او اتى امرأة في دبرها فقد مما برئ مما انزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে যায় এবং তার কথা সত্য মনে করে, কিংবা হায়য চলাকালে স্ত্রীর নৈকট্যে যায়, কিংবা তার পায়ুতে সঙ্গম করে সে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন ওই বিষয়ের প্রতি, যা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

মুসনাদ-ই ইমাম আহমদ ও সহীহ্ মুসলিম-এ উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

من اتى عرافا فساله عن شئ لم تقبل صلاته اربعين ليلة.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন গণক (গণনা করে অদৃশ্য সম্পর্কে বলে)-এর নিকট গিয়ে তাকে অদৃশ্যের কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, চল্লিশ দিন যাবৎ তার নামায ক্ববূল হবে না।

আর মুসনাদ-ই বায্যার-এর মধ্যে হযরত ইমরান ইবনে হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

من اتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে যায় এবং তার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে ওই বস্তুর সাথে কুফর করলো, যা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

'মু'জাম-ই কবীর' 'ত্বাবারানী'তে হযরত ওয়াসিলাহ্ ইবনে আসক্বা' রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

من اتى كاهنا فسأله عن شئ حجبت عنه التوبة اربعين ليلة فان صدقه بما قال كفر.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট গিয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে, চল্লিশ দিন যাবৎ তার তাওবা নসীব হবে না। আর যদি তার কথায় বিশ্বাস করে, তবে সে কাফির হলো। উল্লেখ্য, জিনদেরকে অদৃশ্য বিষয়ে প্রশ্ন করাও এর অন্তর্ভুক্ত।[১০৪]

কোন্ ধরনের আংটি পরা জায়েয?

সাড়ে চার মাশাহ্ (এক মাশাহ্ = আট রত্তি) থেকে কম ওজনের চাঁদী বা রৌপ্যের ও একটি পাথরের আংটি পরিধান করা পুরুষের জন্য জায়েয। আর দু'টি আংটি কিংবা কয়েক পাথরের একটি আংটি, কিংবা সাড়ে চার মাশাহ্র চেয়ে বেশী চাঁদী এবং স্বর্ণ, কাঁসা, পিতল, লোহা ও তামার আংটি নিঃশর্তভাবে না-জায়েয। ঘড়ির স্বর্ণ ও চাঁদীর চেইন পুরুষের জন্য হারাম এবং ধাতুর তৈরী হলেও নিষিদ্ধ। আর যেসব জিনিষ উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো পরে নামায পড়া ও ইমামত করা 'মাকরূহ-ই তাহরীমী'।[১০৫]

নম্রতা ও কঠোরতা

দেখুন, নম্রতার যে উপকারিতাসমূহ রয়েছে, তা কঠোরতার মধ্যে কখনো অর্জিত হতে পারে না। যদি ওই ব্যক্তির প্রতি কঠোরতা করা হতো, তবে মোটেই একথা হতো না। যেসব লোকের আক্বাইদ নড়বড়ে হয়, তার প্রতি নম্রতা দেখানো হবে, যাতে সে ঠিক হয়ে যায়। ওহাবীদের বড় বড় যেসব লোক রয়েছে, তাদের প্রতিও প্রাথমিক পর্যায়ে অতি নম্রতা দেখানো হয়েছে। কিন্তু যেহেতু তাদের হৃদয়গুলোতে ওহাবী মতবাদ পরিপক্ক হয়ে গিয়েছিলো এবং **ثم لايعودون** (অতঃপর তারা ফিরে আসবে না) তাদের বেলায় প্রযোজ্য হয়ে গিয়েছিলো, সেহেতু তারা সত্যকে মানে নি, তখন কঠোরতা অবলম্বণ করা হয়েছে। কারণ, মহামহিম রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

يآيها النبي جاهد الكفار والمنافقين (অর্থাৎ- হে নবী! জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিক্বদের বিরুদ্ধে এবং তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বনা করুন!) আর মুসলমানদেরকে এরশাদ ফরমাচ্ছেন- **وليجدو فيهم غلظة** (এবং এটা অপরিহার্য যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়।)[১০৬]

১০৪ ফাতাওয়া-ই আফরীক্বিয়্যাহ্ ঃ পৃষ্ঠা-৭৩-৭৪
১০৫ আহকাম-ই শরীয়ত ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৩০
১০৬ পারা ১০ ঃ রুকূ ঃ ১৬। তরজমা-কানযুল ঈমান, আল্-মালফূয

কালো খিযাব

আরয ঃ কালো খিযাব যদি 'ওয়াসমাহ্' বা এক প্রকার গাছের পাতা দ্বারা খিযাব করা হয়, তাহলে তা বৈধ কিনা?

ইরশাদ ঃ 'ওয়াস্মাহ' দ্বারা করা হোক, কিংবা 'তাসমাহ' দ্বারা করা হোক, কালো খিযাব হারাম।

আরয ঃ যদি যুবতী নারীর সাথে দুর্বল পুরুষ বিয়ে করতে চায় তাহলে সে কালো খিযাব করতে পারবে কি না?

ইরশাদ ঃ বুড়ো ষাঁড়ের শিং কেটে ফেললে তা বাছুর হতে পারে না।[১০৭]

কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকার অর্থ

এ কথা মিথ্যা যে, একজনের রোগ উড়ে গিয়ে অন্যের গায়ে লাগে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান- **لاعدوى** অর্থাৎ রোগ উড়ে এসে লাগে না। আরো এরশাদ ফরমান- **فمن اعدى الاول** (অর্থাৎ- এ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে যদি ওই প্রথম ব্যক্তির রোগ স্পর্শ করে, তাহলে ওই প্রথম ব্যক্তিকে কার রোগ স্পর্শ করেছে?)

যে রোগীর শরীর থেকে নাপাক বস্তু বের হয় এবং কাপড়ে লাগে, যেমন খোশ-পাঁচড়া ও আল্লাহ্রই পানাহ্, কুষ্ঠরোগ, তার কাপড়-চোপড় পরা উচিত নয়; তবে তাও এ ধারণায় নয় যে, তার রোগ লেগে যাবে, বরং নাপাক থেকে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য। আর যেখানে এটা থাকে না, সেখানে কাপড় পরলে ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে, আহার করার ক্ষেত্রেও-যখন ঈমান মজবুত হয়, এ মর্মে যে, আল্লাহ্র নির্দ্ধারিত অদৃষ্টের কারণে, আল্লাহ্রই পানাহ্! তার ওই রোগ হয়ে যাবে। সুতরাং এ কথা মনে করবে না যে, তার সাথে আহার করার কিংবা তার কাপড় পরার কারণে এ রোগ হয়েছে। এ কাজটা না করলে তা হতো না। আর যদি দুর্বল ঈমানের লোক হয়, তবে সে যেনো ওই সব রোগগ্রস্ত লোকদের থেকে দূরে থাকে, যেগুলো সংক্রামক হওয়া সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। যেমন, কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে। আল্লাহ্ তা'আলারই পানাহ। এ দূরে থাকাও যেনো এ ধারণায় না হয় যে, রোগ লেগে যাবে। কারণ, এটা একটা প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল ধারণা। বরং এ ধারণায় যে, আল্লাহ্র আশ্রয়প্রার্থনাক্রমে, যদি আল্লাহ্র নির্ধারিত অদৃষ্টের কারণে কিছু হয়, তবে ঈমান এমন মজবুত না হয় যে, শয়তানী প্ররোচনা দূর করবে, আর যখন দূর করা সম্ভবপর না হয়,তবে ভ্রান্ত বিশ্বাসের শিকার হতে হবে। সুতরাং তা থেকে বেঁচে থাকবে।এমনসব লোকদের প্রতি হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে-

১০৭ আল-মালফূয ঃ ৩য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১৬।

فر عن المجذوم كما تفر عن الاسد (অর্থাৎ কুষ্ঠরোগীর নিকট থেকে পলায়ন করবে যেভাবে বাঘ-সিংহ থেকে পলায়ন করে থাকো। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।[১০৮]

তামাক ব্যবহার করা কেমন?

ক্ষতি হয় এবং অনুভূতি বিকৃত হয়- এতটুকু পরিমাণ আহার করা হারাম। আর এভাবে আহার বা পান করা মাকরূহ যে, মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকে। আর যদি স্বল্প পরিমাণে বিশেষ করে মুশ্ক ইত্যাদি দ্বারা সুবাসিত করে পানের সাথে আহার করে, আর প্রতিবার আহার করার পর কুল্লি করে মুখ পরিস্কার করে নেয়, যাতে দুর্গন্ধ আসতে না পারে, তাহলে নিরেট মুবাহ। দুর্গন্ধ প্রবাহিত অবস্থায় কোন ওযীফা পাঠ করা উচিত নয়। মুখ ভালো করে সাফ করার পর করা চাই। ক্বোরআন মজীদ তো মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হবার সময় পাঠ করা আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর যদি দুর্গন্ধ না থাকে তবে দুরূদ শরীফ ও অন্যান্য ওযীফা এমতাবস্থায়ও পাঠ করা যেতে পারে, যখন মুখে পান কিংবা তামাক রয়েছে; যদিও উত্তম হচ্ছে- পরিস্কার করে নেওয়া। কিন্তু ক্বোরআন মজীদ তেলাওয়াত করার জন্য অবশ্যই পুরোপুরিভাবে সাফ করে নেবে। ফিরিশ্তাদের মধ্যে ক্বোরআন-ই আযীমের প্রতি খুব আগ্রহ। আর সাধারণ ফিরিশতাদেরকে ক্বোরআন মজীদ তেলাওয়াত করার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। যখন মুসলমান ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে, তখন ফিরিশ্তা তার মুখের উপর নিজের মুখ রেখে তেলাওয়াতের স্বাদ উপভোগ করে। তখন যদি তার মুখে খাদ্যবস্তু লেগে থাকে তখন ফিরিশ্তাদের কষ্ট হয়। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান-

طيبوا افواهكم بالسواك فان افواهكم طريق القرآن. رواه السنجري من الابانة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بسند حسن.

অর্থাৎ নিজেদের মুখ মিসওয়াক দ্বারা পরিচ্ছন্ন করো। কারণ, তোমাদের মুখগুলো হচ্ছে ক্বোরআনের রাস্তা।[১০৯]

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান-

اذا قام احدكم يصلي من الليل فليستك. ان احدكم اذا قرأ في صلوته وضع ملك فاه على فيه ولايخرج من فيه شئ الافم الملك.

অর্থাৎ যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য ওঠবে, তখন সে যনো মিস্ওয়াক করে নেয়। কারণ, তোমাদের যে কেউ নামাযে তেলাওয়াত করুক, ফিরিশ্তা তার মুখের উপর মুখ রাখে যা তার মুখ থেকে বের হয়, তা ফিরিশতার মুখে প্রবেশ করে।

১০৮ আহকাম-ই শরীয়ত ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৬৮।

১০৯ আহকাম-ই শরীয়ত ঃ ১ম খণ্ড ঃ ৭০ পৃষ্ঠা।

ইমাম বায়হাক্বী তার 'শু'আবুল ঈমান'-এ, আর পুরোটাই তাঁর 'ফাওয়াইদ'এ এবং দ্বিয়া 'মুখতারা'য় হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। সেটা একটা সহীহ্ হাদীস।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

ليس شئ اشد على الملك من ريح الثمر ماقام عبد الى صلوة قط الفتم فاه ملك ولايخرج من فيه اية الايدخل في الملك

অর্থাৎ ফিরিশতার নিকট আহারের দুর্গন্ধের চেয়ে বেশী কঠিন (কষ্টদায়ক) অন্যকিছু নেই। যখন কোন মুসলমান নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন ফিরিশ্তা তার মুখকে নিজের মুখে নিয়ে নেয়। ফলে যেই আয়াত মুখ থেকে বের হয়, তা ফিরিশতার মুখে প্রবেশ করে। মহান আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞান।[১১৩]

নারীদের অলঙ্কার

নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার পরা জায়েয-

الذهب والحرير حل لاناث امتي وحرام على ذكورها. (رواه ابو بكر ابن ابي شيبة عن زيد بن ارقم والطبراني فى الكبير عنه وعق واثلة رضى الله تعالى عنهما)

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান-স্বর্ণ ও রেশম আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম। (এটা বর্ণনা করেছেন- হযরত আবূ বকর ইবনে আবী শায়বাহ্ হযরত যায়দ ইবনে আরক্বাম থেকে এবং তাবরানী তাঁরই থেকে কবীরের মধ্যে ও হযরত ওয়াসিলাহ্ থেকে। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা।

বরং নারী তার স্বামীর জন্য গয়না পরা ও সাজসজ্জা করা মহা সাওয়াবের মাধ্যম এবং তাদের জন্য নফল নামায থেকে উত্তম।

কোন এক নেক্কার মহিলা নিজে ও তাঁর স্বামী উভয়েই ওলী ছিলেন। প্রতি রাতে এশার নামাযের পর মহিলটি পূর্ণ সাজসজ্জা করে দুলহান সেজে তাঁর স্বামীর নিকট যেতেন। যদি তাঁর প্রতি স্বামীর প্রয়োজন দেখতে পেতেন, তবে তিনি সেখানে হাযির থাকতেন। অন্যথায় অলঙ্কার ও ওই বিশেষ পোশাক খুলে রেখে দিয়ে মুসাল্লা বিছাতেন এবং নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন।

১১৩ আহকাম-ই শরীয়ত ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৭০ সামনানী প্রেস. মীরাঠ।

বরং নারীর জন্য সাধ্যানুসারে অলঙ্কার না পরে একেবারে অলঙ্কারবিহীন অবস্থায় থাকা মাকরূহ। কারণ, তা পুরুষের মতো হয়ে যায়। হাদীস শরীফে আছে- রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাওলা আলী কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহুল করীমকে বললেন- **يا علي مرنسآئك لاتصلين عطلاء** (অর্থাৎ হে আলী! তোমার পর্দানশীন নারীদের বলে দাও যেন তারা অলঙ্কার ছাড়া নামায না পড়ে।)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সিদ্দীক্বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা নারীদের অলঙ্কার ছাড়া নামায পড়াকে মাকরূহ মনে করতেন। আর বলতেন, "অন্য কিছু না পেলে একটা ডোরা হলেও গলায় বেঁধে নেবে।"

বাজনা বিশিষ্ট অলঙ্কার নারীদের জন্য এ অবস্থায় জায়েয যে, তারা মুহরিম নয় এমন লোকদের, যেমন- খালা, মামা, চাচা ও ফুফীর ছেলেগণ, ভাশুর, দেবর ও ভগ্নিপতিদের সামনে আসে না। তার অলঙ্কারের ঝঙ্কারও যেনো মুহরিম নয় এমন কারো কানে না পৌঁছে। আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা এরশাদ ফরমান- **لايبدين زينتهن الا لبعولتهن** অর্থাৎ নিজেদের সাজসজ্জা যেনো আপন স্বামী কিংবা মুহরিম ব্যতীত অন্য কারো নিকট প্রকাশ না করে।[১১১]

আরো এরশাদ ফরমাচ্ছেন- **ولا يضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن.** অর্থাৎ নারীগণ যেনো তাদের পাগুলো সজোরে না ফেলে, যাতে তার গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ পেয়ে যায়।[১১২]

মুসলমানগণ কাফিরদের মেলায় যাওয়া

আরয ঃ হিন্দুদের মেলাগুলোতে, যেমন-'দসহারা' বা শারদীয় পূজা ইত্যাদিতে মুসলমানদের যাওয়া কেমন?

ইরশাদ ঃ তাদের মেলা দেখার জন্য যাওয়া যে কোন অবস্থাতেই না-জায়েয। যদি তাদের ধর্মীয় মেলা হয়, যাতে তারা তাদের কুফর ও শির্ক করে, কুফরী শব্দাবলী উচ্চারণ করে শোর-চিৎকার করে, তখন তো অবৈধ হওয়া সুস্পষ্টই। বস্তুতঃ এমতাবস্থায় জঘন্য হারাম, কবীরাগুনাহ্র সামিল। অবশ্য, কুফর বলা যাবে ন- যদি সে কুফরী কথাবার্তগুলোর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। অবশ্য যদি, না'ঊযু বিল্লাহ্, সে কোন একটি কুফরী কথা পছন্দ করে নেয়, কিংবা হাল্কা জানে, তবে সে স্বয়ং কাফিরই হবে।

১১১ পারা ১৮ ঃ রুকূ' ১০।

১১২ পারা ১৮ ঃ রুকূ' ১০- ইরফান-ই শরীয়ত ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ঃ ১৯-২০।

হাদীস শরীফে আছে-যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের দল ভারী করে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। আর যে কেউ কোন সম্প্রদায়ের কোন কাজকে পছন্দ করে, সে ওই কাজ সমধাকারীদের সাথে শরীক।[১১৩]

যদি কাফিরদের ধর্মীয় মেলা না হয়, নিছক খেলাধূলার হয়, তবু তা নিষিদ্ধ ও মন্দ কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভবই। সুতরাং নিষিদ্ধ কার্যাদির তামাশা উপভোগ করা বৈধ নয়।[১১৪]

যদি খেলাধুলারই হয় আর নিজে তা থেকে বিরত থাকে-না তাতে শরীক হয়, না তা দেখে, না তাতে এমনসব বিষয়াদি থাকে, যেগুলোর কারণে তাদের খেলাধূলাকে নিষিদ্ধ করে দেয়, তবে জায়েয বটে। তারপরও বিরত থাকাই উচিত হবে। কারণ, তাদের জমায়েত সব সময় অভিসম্পাতের স্থানই হয়। সুতরাং তা থেকে দূরে থাকাতেই মঙ্গল। সুতরাং আলিমগণ বলেছেন, তাদের মহল্লার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে হলে তা দ্রুতগতিতে অতিক্রম করে যাওয়াই উত্তম।[১১৫]

আর যদি নিজে শরীক হয়, কিংবা তামাশা দেখে কিংবা তাদের নিষিদ্ধ খেলাধূলার সামগ্রী বেচাকেনা করে, তবে তাতো খোদই গুনাহ্ ও না-জায়েয।

অবশ্য, একটি সূরত আছে নিঃশর্তভাবে জায়েয হবার। তা হচ্ছে-যদি আলিম তাদেরকে হিদায়ত ও ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার জন্য যান, যখন তা করার শক্তি থাকে। এ ধরনের যাওয়া ভালো ও প্রশংসিত-যদিও হয় তাদের ধর্মীয় মেলা। এমনিভাবে বহুবার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ নিয়ে গেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১১৬]

বংশ নিয়ে গর্ব-অহঙ্কার করা বৈধ নয়

১. বংশ নিয়ে গর্ব-অহঙ্কার করা জায়েয নয়।
২. বংশের কারণে নিজেকে নিজে বড় জানা, অহঙ্কার করা বৈধ নয়।
৩. অন্য কারো বংশের প্রতি তিরস্কার করা জায়েয নয়।
৪. কারো বংশীয় মর্যদা কম থাকার কারণে তাকে হীন জ্ঞান করা না-জায়েয।

১১৩ আবূ ইয়া'লা, মুসনাদ-ই আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক, কিতাবুয্ যুহ্দ ইত্যাদি।
১১৪ তাতার খানিয়া ও হিন্দিয়াহ্ ইত্যাদি।
১১৫ গুনিয়া, নিকটাত্মীয় সম্পর্কিত অধ্যায়, ফত্হুল মু'ঈন ও তাহতাভী।
১১৬ ইরফান-ই শরীয়ত ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১৬-২৮।

৫. বংশকে কারো অনুকূলে লজ্জা ও গালিতুল্য মনে করা অবৈধ।
৬. এ কারণে কোন মুসলমানের অন্তরে আঘাত দেওয়া বৈধ নয়।
৭. হাদীস সমূহ, যেগুলো এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর অর্থে উক্তসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। মুসলমান, বরং কাফির-যিম্মীকেও শরীয়তের প্রয়োজন ব্যতীত এমন শব্দ দ্বারা ডাকা কিংবা এমন অর্থ বের করা, যার কারণে তার মনে আঘাত পায়- শরীয়ত মতে না-জায়েয ও হারাম; যদিও কথাটি মূলতঃ সত্য হয়।[১১৭]

যদি কোন চামারও মুসলমান হয়, তবে মুসলমানদের ধর্মে তাকে ঘৃণার চোখে দেখা হারাম বরং কঠোরভাবে হারাম। সে আমাদের দ্বীনী ভাই হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন- **انما المؤمنون اخوة** (নিঃসন্দেহে মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই)।[১১৮]

পবিত্র শরীয়তে আভিজাত্য ও মর্যাদা বংশ বা সম্প্রদায়ের উপর সীমাবদ্ধ নয়। মহামহিম আল্লাহ্ এরশাদ ফরমাচ্ছেন- **ان اكرمكم عند الله اتقاكم** অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বেশী মর্যাদাসম্পন্ন সে-ই, যে বেশী তাক্বওয়ার অধিকারী।

তবে, বিয়ে-শাদীতে এটা শরীয়ত মতে অবশ্যই বিবেচ্য। বাপ-দাদা ব্যতীত অন্য কোন অভিভাবকের হাতে এ ইখতিয়ার নেই যে, না-বালেগ কনের বিবাহ এমন কোন অসম পাত্রের সাথে করাবে, যার কারণে তার শাদী প্রচলিত অর্থে লজ্জার ব্যাপার হয়। অন্য কেউ তা করলে বিয়ে শুদ্ধ হবে না। সুস্থ বিবেকসম্পন্না ও বালেগা নারীর জন্যও এ অনুমতি নেই যে, সে অভিভাবকের সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে নিজের বিয়ে কোন অসম পাত্রের সাথে করে নেবে। যদি করে নেয় তবে ওই বিয়ে তার অভিভাবক ভেঙ্গে দিতে পারবে।।[১১৯]

কাউকে পেশার কারণে হীন মনে করা

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা কুদ্দিসা সিররুহু থেকে 'আনসারী বারাদী'কে 'মু'মিন' সম্বোধন প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলো। আরো জিজ্ঞাসা করা হলো যেসব লোক তাদেরকে তিরস্কার স্বরূপ মু'মিন বলবে, তাদের সম্পর্কে বিধান কি? তখন তিনি যে জবাব দিয়েছেন, তা লক্ষণীয়। পূর্ণ প্রশ্ন ও জবাব পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরলাম ঃ

প্রশ্ন ঃ সম্মানিত ওলামা-ই দ্বীন, আপনাদের অভিমত কি? এ মাস্আলায় যে, 'মু'মিন' বলা কি কোন সম্প্রদায় ইত্যাদির সাথে খাস, না আম উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর-ই এ বৈশিষ্ট্য।

১১৭ ইরাআতুল আদাবি লি ফাদ্বলিন্ নাসাবি ঃ পৃষ্ঠা ২-৩১, সামনানী প্রেস, মীরাঠ।
১১৮ ফাদাওয়া-ই রেযভিয়াহ্ ঃ ৫ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ২৯৪, মুবারকপুরে মুদ্রিত।
১১৯ ফাতাওয়া-ই রেয়ভিয়াহ্ ঃ ৫ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ২৯৫। দলীলাদি মূল কিতাবে দেখুন- নো'মানী।

দ্বিতীয়ত যদি কেউ তিরস্কার স্বরূপ উক্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে 'মু'মিন' বলে, তবে তার সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?

জবাব ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, সমস্ত মুসলমান মু'মিন। ভারত উপমহাদেশের কোন কোন রাষ্ট্রীয় পরিভাষায় ওই সম্প্রদায়কে মু'মিন বলা হয়, সম্ভবতঃ এতদ্‌ভিত্তিতে যে, ওই সব লোক বেশীরভাগ সুস্থ হৃদয় ও স্বভাবের হয়, যার ফলে অন্যান্য মুসলমান মনে কষ্ট পায়। অথচ হাদীসে পাকে এরশাদ হয়েছে যে, মু'মিন হচ্ছে সে-ই যার প্রতিবেশীরা তার নির্যাতন থেকে নিরাপদে থাকে (**المؤمن من امن جاره بوائقه**)

আর এ শব্দ তিরস্কারস্বরূপ তাদেরকে বলা, অন্য একটা দোষ। একে তো মুসলমানকে তার বংশীয় সম্পর্ক ও পেশার কারণে হীন মনে করা হয়, দ্বিতীয়ত এমন মহান উপাধিসূচক শব্দকে তিরস্কারের স্থানে ব্যবহার করা হয়। এমন লোকের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং আপন রসনাকে হিফাযত করা। হে আল্লাহ! আমাকে ও মুসলমানদেরকে হিদায়তের উপর রাখো। নিশ্চয় আপনি সর্বাধিক দয়ালু। আমীন!![১২০]

হালালখোর মুসলমান সম্পর্কে বিধান

মাসআলা : হালালখোর মুসলমান, যে পাঁচ ওয়াক্বতের নামায পড়ে- এভাবে যে, নিজের পেশা থেকে অবসর হয়ে গোসল করবে, পাক-পবিত্র কাপড় পরে মসজিদে যাবে, তাহলে সে জমা'আতে শরীক হতে পারবে কিনা? আর যদি জমা'আতে শরীক হয়, তবে কি সে পেছনের কাতারে দাঁড়াবে, না যেখানে স্থান পায় সেখানে দাঁড়াতে পারবে? অর্থাৎ প্রথম কাতারেও দাঁড়াতে পারবে কিনা? তাছাড়া, নামাযের পরে মুসলমানদের সাথে করমর্দন করতে পারবে কিনা? সে মসজিদের লোটাগুলো দিয়ে ওযূ করতে পারবে কি না? আর যেই হালালখোর শুধু বাজারে ঝাড়ু দিয়ে রোজগার করে তার সম্পর্কে কি বিধান? সংক্ষেপিত।

সমাধান ঃ নিঃসন্দেহে সে জমা'আতে শরীক হতে পারবে। নিঃসন্দেহে সবার সাথে মিলিত হয়ে দাঁড়াবে। নিশ্চয় প্রথম ও দ্বিতীয় কাতারে কিংবা যেখানে স্থান পাবে সেখানে দাঁড়াবে। কেউ কাউকে শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া মসজিদে আসতে, কিংবা জমা'আতে শরীক হতে কিংবা প্রথম কাতারে শামিল হতে কখনো বাধা দিতে পারে না।

১২০ ফতাওয়া-ই রেভিয়াহ্ ঃ ৫ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ২৯২, সুন্নী দারুল ইশা'আত, মুবারকপুর।

আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লা এরশাদ ফরমান- **ان المساجد لله** অর্থাৎ নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- **العباد عباد الله** অর্থাৎ বান্দারা সবাই আল্লাহরই বান্দা। যখন বান্দারা সবাই আল্লাহরই আর মসজিদগুলোও সবই আল্লাহ্‌রই, তখন কেউ কোন বান্দাকে মসজিদের কোন স্থান থেকেই আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত কিভাবে রুখতে পারে? আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লা এরশাদ ফরমায়েছেন-

ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه

অর্থাৎ ওই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম কে, যে আল্লাহ্‌র মসজিদগুলোতে বাধা সৃষ্টি করে সেগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া থেকে। এতে কোনরূপ বিশেষ শর্তারোপ করা হয় নি। প্রকৃত বাদশাহ আল্লাহু আয্‌যা জালালুহুর এটা আম দরবার। এখানে এমনটি হতে পারে না যে, এটা খান সাহেব, শেখ সাহেব, মুঘল সাহেব কিংবা ব্যবসায়ী, জমিদার কিংবা অর্থশালীদের জন্যই, কম মর্যাদার বংশের লোক কিংবা হীন পেশার লোক আসতে পারবে না! আলিমগণ কাতারগুলোর যেই তারতীব বা বিন্যাসের কথা লিখেছেন, তাতে কোথাও কি কোন সম্প্রদায় কিংবা পেশারও বিশেষত্ব আছে? মোটেই নেই। তাঁরা নিঃশর্তভাবে লিখেছেন- কাতার করবে এভাবে- প্রথমে দাঁড়াবে পুরুষগণ, তারপর বালকরা, তারপর হিজড়াগণ, তারপর নারীরা।

নিশ্চয় মেহতর কিংবা ঝাড়ুদার মুসলমান পাক শরীর ও পাক পোশাক বিশিষ্ট, যখন পুরুষ ও বালেগ হয়, তাহলে তাকে প্রথম কাতারে দাঁড় করানো যাবে। আর খান সাহেব, শেখ ও মুঘল সাহেবের ছোট ছেলে দাঁড়াবে পেছনের কাতারে। যে ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম করবে, সে শরীয়তের বিধানের বিপরীত কাজই করবে। উপরোক্ত ব্যক্তি যেই কাতারে দাঁড়াবে, যদি কেউ তাকে হীন মনে করে তার থেকে দূরে দাঁড়ায়, মাঝখানে ফাঁক রেখে দেয়, তবে সে গুনাহগার হবে। আর এ কঠোর শাস্তির হুমকির উপযোগী হবে যে, হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- **من قطع صفا قطعه الله** (অর্থাৎ- যে ব্যক্তি কাতারকে কেটে ফেলে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা কেটে ফেলবেন) আর যেই বিনয়ী মুসলমান, সাচ্চা ঈমানদার আপন মহান রব ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ পালনার্থে তার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মর্যাদা উঁচু করবেন। আর সে এ-ই সুন্দর প্রতিশ্রুতির উপযোগী হবে যে, হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- **من وصل صفا وصله الله** (অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাতারকে মিলাবে, তাকে আল্লাহ্ মিলিয়ে দেবেন।

আমাদের নবী-ই করীম আলায়হি ওয়া'আলা আলিহী আফদ্বালুস্ সালাতি ওয়াত্ তাসলীম এরশাদ ফরমান- الناس بنو ادم وادم من تراب (অর্থাৎ সমস্ত মানুষ আদমের সন্তান আর আদম আলায়হিস্ সালাম মাটি থেকে।)[১২১] অন্য এক হাদীসে হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান-

يايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعر بى على عجمى ولا لعجمى على عر بى ولا الا حمر على اسود ولا لا سود على احمر الا بالتقوى ان اكر مكم عند الله اتقا كم

অর্থাৎ- হে লোকেরা! তোমাদের সবার রব এক এবং নিশ্চয় তোমাদের সবার পিতা এক, শুনে নাও! অনারবীয়ের উপর আরবীয়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, না আরবীয়ের উপর অনারবীয়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব আছে, না কৃষ্ণাঙ্গের উপর শেতাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব আছে, না কেতাবে উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব, কিন্তু খোদাভীরুতার কারণে। নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান হচ্ছে যে তোমাদের মধ্যে বেশী খোদাভীরু।[১২২]

অবশ্য, এতে সন্দেহ নেই যে, মেহতরের পেশা শরীয়ত মতে একটি মাকরূহ বা অপছন্দনীয় পেশা- যখন একেবারে অপরিহার্য হয়ে না পড়ে। যেমন- যেখানে কাফির ভাঙ্গী পাওয়া যায় না, যারা এ পেশার জন্য বাস্তবিকপক্ষে উপযোগী, না সেখানে এমন জমি হয়, যেমন আরবের জমি, যা ময়লার আর্দ্রতাকে চুষে নেয়, এমনি স্থানে যদি কোন মুসলমান মুসলমানদের থেকে কষ্ট দূরীকরণ ও তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়্যতে ওই পেশা অবলম্বন করে, তবে বাধ্য হয়ে তা গ্রহণ করেছেন বলে বিবেচ্য হবে। আর যেখানে এমন পরিস্থিতি না হয়, সেখানে নিঃসন্দেহে মাকরূহ। তবে তাও অবশ্যই ফাসেক্বীর পর্যায়ভূক্ত হবে না।[১২৩]

কিন্তু ওই বংশীয় লোকদের এমন লোকদের থেকে দূরে থাকা অবশ্যই এতদ্ভিত্তিতে হবে না যে, এরা একটা মাকরূহ পেশা অবলম্বনকারী। কারণ, ওই দূরে অবস্থান গ্রহণকারীরা নিজেরা তো শতশত হারাম ও গুনাহে কবীরা সম্পন্ন করে থাকে।

সুতরাং যদি এ কারণে ঘৃণাটুকু হতো তবে তারাই সর্বাধিক ঘৃণার পাত্র হওয়ার উপযোগী। ওইসব সাহেবের কাতারে তো নিশাখোর, জূয়াবাজ, সুদখোর, শেখ সাহেব, ব্যবসায়ী, ঘুষখোর, মির্যা সাহেব এবং পদস্থ ব্যক্তিও এসে দাঁড়ায়। অথচ তারা মোটেই ঘৃণা বোধ করেন না! আর যদি কোন কাপ্তান কিংবা কালেক্টর সাহেব, মেজিষ্ট্রেড সাহেব কিংবা এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সাহেব অথবা ডিপুটি জজ এসে সামিল হয়,

১২১ আবূ দাউদ, তিরমিযী ও বায়হাক্বী।

১২২ ইমাম বায়হাক্বী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন।

১২৩ অর্থাৎ ওই পেশা অলম্বণকারী ফাসিক্ব হবে না।

তবে তাদের পাশে দণ্ডায়মান হওয়াকে তো গর্বের কারণ মনে করেন। অথচ আল্লাহ্ ও রসূলের নিকট এ হারাম কাজ ও পেশা কোন মাকরূহ কাজ অপেক্ষা বহুগুণ বেশী মন্দ। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, তাদের এ ঘৃণা আল্লাহ্র ওয়াস্তে নয়, বরং নিছক নাফ্সের তাড়নায় এবং প্রচলিত প্রথার অহঙ্কারের অবস্থা মাত্র। অহঙ্কার সর্বাধিক মন্দ আবর্জ্জনা। আর হৃদয় হচ্ছে সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও ভদ্র অঙ্গ। আফ্সোস্! আমাদের হৃদয় ওই আবর্জ্জনায় ভর্তি অথচ আমরা ওই মুসলমানকে ঘৃণা করছি, যে এ মুহূর্তে পাক-সাফ, শরীর ধুয়েছে, পবিত্র পোশাক পরিধান করেছে। মোটকথা, যেসব হযরত এ অনর্থক কারণ ও অজুহাতে ওই মুসলমানকে মসজিদে আসতে বাধা দিচ্ছেন, তারা এই মহা বিপদে গ্রেফতার হবেন, যা আয়াত শরীফে এরশাদ হয়েছে- "তার থেকে অধিক যালিম কে?..." আর যেসব ব্যক্তি খোদ্ এ কারণে মসজিদ ও জমা'আত বর্জন করবে, তাঁরা ওইসব কঠোর হুমকির উপযোগী হবেন, যেগুলো তা বর্জন করার জন্য এসেছে। এমনকি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন-

الجفاء كل الجفآء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي ويدعو الى الفلاح فلا يجيبه

অর্থাৎ যুল্ম পূর্ণাঙ্গ যুল্ম এবং কুফর ও নিফাক্ব হচ্ছে এ যে, মানুষ মুআয্যিনকে নামাযের জন্য আহ্বান করতে শুনে, অথচ হাযির হয় না।[১২৪]

আর আল্লাহ্র যেই বান্দা আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল্লার বিধানাবলীর প্রতি গর্দান ঝুঁকিয়ে নিজের নাফসকে দমন করবে এবং ওই ঘৃণা ও আলাদা থাকা থেকে বিরত থাকবে, সে নাফসের সাথে যুদ্ধ করা ও বিনয় অবলম্বনের মহা প্রতিদান পাবে। ভালো কথা-মনে করুন, ওই মসজিদগুলো থেকে তো তাদেরকে রুখে দিলো, আর ওই মযলূম বেচারাগণ নিজ নিজ ঘরেই নামায পড়ে নিলো। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উঁচু মর্যাদার মসজিদ মসজিদুল হারাম শরীফ থেকে তাদেরকে কে রুখবে? ওই মুসলমানের উপর যদি হজ্জ্ ফরয হয়, তবে কি তাকে হজ্জ্ থেকেও রুখবে এবং আল্লাহ্র ফরয থেকেও বিরত রাখবে? না মসজিদ-ই হারামের বাইরে অন্য কোন নতুন কা'বা তার জন্য বানিয়ে দেবে, যাতে সে তাওয়াফ করবে? আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে হিদায়ত করুন। আমীন!!

এ তাক্বরীর থেকে প্রমাণিত হলো যে, মসজিদের লোটা, যা সাধারণ মানুষের জন্য ওয়াক্বফ করা হয়েছে। তা দ্বারা ওযূ করতেও তাকে কেউ নিষেধ করতে পারবে না- যদি তার হাত পাক থাকে। বাকী রইলো করমর্দন। নিজ থেকে প্রথমে করা, কিংবা না করার মধ্যে ইখতিয়ার রয়েছে কিন্তু যখন ওই মুসলমান করমর্দন করার জন্য হাত বাড়ায়, আর আপনি ওই অনর্থক ধারণায় নিজের হাত গুটিয়ে নেন, তাহলে নিঃসন্দেহে কোন শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকেই আপনি তার অন্তর ভাঙ্গলেন।

১২৪ ইমাম আহমদ এবং ইমাম তাবারানী 'কবীর'-এর মধ্যে হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে উত্তম সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

বস্তুতঃ কোন শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া কোন মুসলমানের হৃদয় ভাঙ্গা অকাট্যভাবে হারাম। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলো, সে নিঃসন্দেহে আমাকে কষ্ট দিলো। আর যে আমাকে কষ্ট দিলো, সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লাকে কষ্ট দিলো।"[১২৫]

দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া খরিদ করার অপকারিতা

কোন সাচ্চা দ্বীনী কর্মের মাধ্যমেও দুনিয়া চাইবে না। কারণ' তা হবে- আল্লাহ্রই পানাহ! দ্বীন বিক্রি করার সামিল। যেমন, কোন কোন ফক্বীর হজ্জ্ করে আসে। তারা জায়গায় জায়গায় নিজের হজ্জ্ বিক্রি করে ঘুরে বেড়ায়। তারপর তা আর কোথাও বিক্রি করতে পারে না। হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি আখিরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া চায়, তার চেহারা বিকৃত করে দেওয়া হবে এবং তার স্মৃতি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে, সর্বোপরি তার নাম দোযখীদের তালিকাভূক্ত করা হবে।

ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম বলেন, এক গোলাম ও তার মুনিব হজ্জ্ করে ফিরছিলো। পথে লবণ ফুরিয়ে গেলো। তার নিকট কোন রাহ্ খরচ ছিলো না, যা দিয়ে কিনে নেবে। এক যাত্রা-বিরতিতে মুনিব বললো, "মুদি দোকানীকে একটু লবণ এ বলে নিয়ে এসো-আমরা হজ্জ্ থেকে আসছি।" সে গিয়ে বললো, "আমি হজ্জ্ থেকে আসছি, আমাকে সামান্য লবণ দিন!" সুতরাং সে লবণ নিয়ে আসলো। দ্বিতীয় যাত্রা বিরতিতে মুনিব আবার প্রেরণ করলো। সে এবার এভাবে বললো, "আমার মুনিব হজ্জ্ থেকে আসছেন। সামান্য লবণ দিন!" সে লবন নিয়ে আসলো। তৃতীয় যাত্রা-বিরতিতে মুনিব পুনরায় পাঠাতে চাইলো। গোলাম তো প্রকৃতপক্ষে মুনিব হওয়ারই উপযোগী ছিলো। সে বললো, "গত পরশু তো লবণের কয়েক দানার বিনিময়ে আমার হজ্জ্ বিক্রি করে এসেছি, গতকাল আপনার হজ্জ্। আজ কার হজ্জ্ বিক্রি করে আনবো?" ইমাম সুফিয়ান সওরী এক ব্যক্তির নিকট দাওয়াতে তাশরীফ নিয়ে যান। মেজবান খাদিমকে বললো, "ওই বর্তনে খানা আনো, যা আমি দ্বিতীয় বার হজ্জে গিয়ে এনেছি।" ইমাম বললেন, "ওহে মিসকীন! তুমি একটি মাত্র বাক্যে দু'টি হজ্জ্ বিনষ্ট করে দিয়েছো!" যখন নিছক 'রিয়া' বা প্রকাশ করার এ অবস্থা, তখন সেটাকে দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম বানানো কতো নিম্ন পর্যায়ের কাজ হবে! মহামহিম আল্লাহ্র-ই পানাহ্!

ওয়াযের পেশা

আজকাল শুধু স্বল্পজ্ঞানীই নয়, বরং গণ্ড মূর্খলোকও উল্টোসিধে উর্দু-বাংলা দেখে স্মরণ শক্তির জোরে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বাকচাতূর্যকে মানুষ শিকারের জাল বানিয়ে নিয়েছে।

১২৫ ইমাম ত্বাবারানী তাঁর 'আল-আওসাত্ব'-এ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে 'হসান' পর্যায়ের সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন। |ফাতাওয়া-ই রেযাভিয়্যাহ্ ঃ ৩য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৩৪৬-৩৪৮, সুন্নী দারুল ইশা'আত, মুরকপুর|

আক্বাইদের ব্যাপারে উদাসীন-গাফিল, মাসআলা-মাসাইল সম্পর্কে মূর্খ-জাহেল; কিন্তু ওয়ায করার জন্য তুমুল ঝড়-ঝঞ্ঝা! প্রতিটি জামে মসজিদে, প্রত্যেক গণজমায়েত ও মজলিসে, যে কোন মেলা-মাহফিলে মিথ্যা হাদীস, ভিত্তিহীন বর্ণনা এবং উল্টো মাসআলা বর্ণনা করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। নানা ধরনের কলা-কৌশল ব্যবহার করে যতটুকু সম্ভব হয়, পকেটস্থ করে নেয়।

প্রথমত ঃ তার জন্য ওয়ায করা হারাম। কবি বলেন-

اوخویشتن گم ست کرا رہبری کند

অর্থাৎ যে নিজে পথহারা, সে কাকে পথ দেখাবে?

রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار অর্থাৎ- যেই জ্ঞানহীন ব্যক্তি ক্বোরআনের অর্থ বা ব্যাখ্যা কিছু বলে সে যেনো নিজের ঠিকানা জাহান্নামে তৈরী করে নেয়।

দ্বিতীয়ত ঃ তাদের ওয়ায শুনা হারাম। এরশাদ হয়েছে- **سمعون للكذب** (তারা মিথ্যা খুব শোনে)। সুতরাং সমগ্র জলসার কুফল ওয়াযকারীর ঘাড়ে বর্তাবে- **من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا** অর্থাৎ- তাদের গুনাহ্র বোঝা থেকে কিছুইহ্রাস করা হবে না।

তৃতীয়ত ঃ ওয়ায-নসীহতকে সম্পদ উপার্জন কিংবা লোকজনকে নিজের ভক্ত বানানোর মাধ্যম বানানো গোমরাহী ও প্রত্যাখ্যাত এবং ইহুদী ও খৃস্টানদেরই কুপ্রথা। ইমাম ফক্বীহ্ আবুল লাইস যদি বর্তমান যুগের অবস্থা দেখে পারিশ্রমিক নিয়ে আযান, ইক্বামত ও শিক্ষাদান করাকে, পরবর্তীদের ফাত্ওয়া মতো, বেশীরভাগ ইমামগণ ও নিজের পূর্ববর্তী অভিমত প্রত্যাহার করে আলিম সমাজকে ওয়ায-নসীহতের জন্য গ্রামে-গঞ্জে যাওয়া ও নযর-নেয়ায গ্রহণ করার অনুমতি দিয়ে থাকেন, তবে তা হবে-বাধ্য হওয়ার অবস্থায় অনুমতি দান, তাও আবার বিশেষ প্রয়োজন হলে এবং বিশেষ করে ওইসব আলিম-ই দ্বীনের জন্য, যাঁরা ওয়ায-নসীহত করার উপযোগী; মূর্খ বা স্বল্পজ্ঞানী লোকদের জন্য নয়, যাদের জন্য ওয়াজ করাও না-জায়েয। কারণ, তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আলিম সমাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করার বর্জন করেছে, তাঁদের ও তাঁদের পরিবার-পরিজনের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করার যেই হক্ব বা কর্তব্য রয়েছে, তা তাঁদের নিকট পৌঁছছে না, ফলে তাঁরা অর্থোপার্জনে ব্যস্ত হয়ে গেছেন, পারিশ্রমিক না নিলে সাধারণ লোকদের হিদায়তের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং যেই বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে এ নিষিদ্ধ কাজটির অনুমতি দেওয়া হয়, সেই কাজটি ওই প্রয়োজন ও প্রয়োজনীয় পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

لان ماكان بضرورة يقدر بقدرها (কেননা, যা প্রয়োজন হবার কারণে বৈধ হয় মাত্র, সেটা প্রয়োজন পরিমাণেই বৈধ হয়), বিনা প্রয়োজনে কিংবা ভাণ্ডার ভর্তি করার জন্য নয়। তারপর এটা নির্ভর করবে নিয়্যতের উপর। যখন আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা, অন্তরের কথা সম্পর্কে অবগত, তার অবস্থা সম্পর্কে জানেন যে, তা তার মূল উদ্দেশ্য মানুষকে হিদায়ত করাই, অর্থ উপার্জন করা নয়, তখন তো সে ওই বাধ্য অবস্থার ফাত্ওয়া দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। অন্যথায়, ওই গোপন ভেদ ও সর্বাধিক গোপন কথাবার্তা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লার মহান দরবারে কোন বাহানা-অজুহাত চলবে না। আর দুনিয়া-ক্রেতা ও দ্বীন-বিক্রেতা হিসেবে নাম পাবে মাত্র। (সাওয়াব-প্রতিদান পাবার আশা করতে পারে না।) মহামহিম আল্লাহরই পানাহ্।[১২৬]

নিফাসের দিনগুলো সম্পর্কে ভুল ধারণার অপনোদন

সাধারণ মূর্খ নারীদের মধ্যে একথা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে যে, যতদিনে চল্লিশ দিন পূর্ণ হয় না, ততোদিন প্রসূতি পাক হয় না। এটা নিছক ভুল। রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার পর অযথা নিজেকে নাপাক ধারণা করে নামায-রোযা ছেড়ে দিয়ে তারা মারাত্মক কবীরাহ গুনাহ্য় লিপ্ত হয়। স্বামীদের উচিত তা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা। নিফাসের জন্য সর্বোচ্চ সময়সীমা রাখা হয়েছে চল্লিশ দিন। এ নয় যে, চল্লিশ দিন থেকে ওই সময়সীমা কমই হয় না। এরকম কোন সময়সীমা নির্ধারিত নেই। যদি সন্তান প্রসবের পর শ্রেফ এক মিনিট রক্ত ক্ষরণ হয়ে বন্ধ হয়ে যায়, তবে প্রসূতি নারী তখনই পাক হয়ে যায়। সে তখনই গোসল করবে এবং নামায পড়বে ও রোযা রাখবে। যদি চল্লিশ দিনের মধ্যে তার রক্তক্ষরণ পুনরায় না হয়, তবে তার নামায-রোযা সবই বিশুদ্ধ থাকবে। তার চুড়ি, চৌকি ও বাসস্থান সবই পাক। শুধু ওই জিনিষই নাপাক হবে, যাতে রক্ত লেগে যায়। এটা ছাড়া ওইসব বস্তুকে নাপাক মনে করা হিন্দুদের কুপ্রথা।[১২৭]

পর্দার কয়েকটি জরুরী বিধিবিধান

পবিত্র শরীয়তে ফুফা, খালু, ভগ্নিপতি, ভাশুর, দেবর, চাচা এবং ফুফী, খালা ও মামার পুত্রগণ এবং পথচারী সব পরপুরুষের একই বিধান, বরং তাদের ক্ষেত্রে বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। কারণ, নিরেট পরপুরুষ থেকে স্বভাবতঃ হিজাব বা পর্দা করা হয়। না সে সহসা সাহস করতে পারে, না সে অনায়াসে ঘরে আসতে পারে, কিন্তু উপরোক্তরা এর বিপরীত। এ কারণে, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

১২৬ আহসানুল ভি'আ ঃ পৃষ্ঠা ১২৬-১৩৪
১২৭ ইরফান-ই শরীয়ত ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৪৮

হুযূর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মহান দরবারে আরয করা হলো- يارسول الله ارأيت الحمو অর্থাৎ হে আল্লাহ্র রসূল! - দেবরের বিধান এরশাদ করুন।!" এরশাদ ফরমালেন, الحمو موت অর্থাৎ দেবর হচ্ছে মৃত্যু।" মহামহিম আল্লাহ্রই পানাহ্।[১২৮]

আযাদ পরনারীর শুধু মুখের অলঙ্কার বা মস্তকভূষণ, যাতে কান, গলা কিংবা চুলের কোন অংশই অন্তর্ভুক্ত নেই এবং হাতের তালুগুলো পায়ের তালু দেখা যদিও হারাম নয়; কারণ, ফরয বর্জন নয়, অবশ্যই মাকরূহ-ই তাহরীমী। কারণ, এ'তে ওয়াজিব বর্জন করা হয়। বাকী রইলো স্পর্শ করা। তাদের ওই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করাও সম্পূর্ণরূপে হারাম। সুতরাং শায়খ বা পীরের জন্য পরনারীর হাত ধরে বায়'আত গ্রহণ করা হারাম।[১২৯]

জরুরী, বরং অত্যন্ত জরুরী মাসআলা

আযাদ নারীর জন্য কোন না-মুহরিম পুরুষের গায়ে হাত লাগানো হারাম, হোক না তার হাত বা পা। আর পুরুষের জন্যও তাকে তার গায়ে হাত লাগানোর অনুমতি দেওয়া হারাম।

এখান থেকে বর্তমান যুগের পীরের ওইসব শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরী যাদের, না-মুহরিম যুবতী মুরীদনীগণ কমদবুচি করে, তাদের হাতে চুমু দেয়, চোখে লাগায় এবং পুরুষের অবাধ মেলামেশার পক্ষে কথা বলে। তাদের এ মাসআলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।[১৩০]

তাদের উপর ফরয হচ্ছে-এসব কাজ থেকে তাদেরকে কঠোরভাবে রুখে দেওয়া। কিছু লোক গোসল করার কাজে নাপিত কিংবা নিজের কোন মাধ্যমে হাত-পা ও পিঠ মালিশ করায়। এটাও হারাম এবং তা থেকে বিরত থাকা ফরয।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

১২৮ ফাতাওয়া-ই রেযভিয়্যাহ্ ঃ ৫ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১৫৬
১২৯ ফাতাওয়া-ই রেযভিয়াহ্ ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৬৫৮
১৩০ ফাতাওয়া-ই রেযভিয়াহ্ ঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৮, আহলে সুন্নাত প্রেস, বেরিলী শরীফ